KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮, মার্কাস স্কোয়ার (ইস্ট, কল-৭৯
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিবর (BIVAR)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 2/2-3 3/1 3/2-3 3/4	Year of Publication : Oct-Dec 1977 July-Sep 1978 April 1979 Aug 1979
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : মণীন্দ্র বক্সী (2/2-3) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

৬

বিভাব

সম্পাদক/মণীশ নন্দী

বিভাব

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Phillips Carbon Black Limited
"Duncan House"
31, Netaji Subhas Road
Calcutta-700001

রবীন্দ্রনাথের

জাতীয় আদর্শ, ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ - বিষয়ক যাবতীয় রচনা পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে সংকলিত।

কালান্তর	১৫·০০	সভ্যতার সংকট	১·৫০
ধর্ম	২·০০	সমবায়নীতি	২·০০
পল্লীপ্রকৃতি	৪·৫০	সঞ্চয়	২·৮০
মানুষের ধর্ম	৩·০০	শিক্ষা	৫·৭৫
শান্তিনিকেতন ১	৮·০০	বিশ্বভারতী	২·৫০
শান্তিনিকেতন ২	১২·০০	আশ্রমের রূপ ও বিকাশ	১·২৫
স্বদেশ	২·৭৫	শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম	২·০০
স্বদেশী সমাজ	৩·০০		

সাহিত্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় অভিভাষণ, পত্র ও প্রবন্ধাবলী, পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে সংকলিত।

আধুনিক সাহিত্য	২·৫০	সাহিত্য	৮·০০
প্রাচীন সাহিত্য	যন্ত্রস্থ	সাহিত্যের পথে	যন্ত্রস্থ
লোকসাহিত্য	২·০০	সাহিত্যের স্বরূপ	১·২০

বাংলাভাষা-পরিচয় ৩·৫০

বিশ্বভারতী

কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় 'জনতার' সরকার একটি নতুন নিয়ম রচনা করেছেন। যার ফলে অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট পত্রপত্রিকা হয় বন্ধ বা প্রকাশ সীমিত করে দিতে হবে। ছোট পত্রপত্রিকা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে সেই সব প্রকাশনা, যার আপাত দীন চেহারার মধ্যে চিরকালই লুকিয়ে থাকে সৎ সৃষ্টিশীল সাহিত্যের তেজী চেহারা এবং যেখানে জাতির সৃষ্টির অগ্রগতি বা অধোগতির প্রতিটি স্পন্দন প্রকৃত ধরা পড়ে। সব ছোট পত্রপত্রিকা নয়, শুধু যোগ্য সাহিত্যমানসম্পন্ন কাগজগুলির কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার দু'ভাবে এটা করছেন। প্রথমত, কেন্দ্রে D. A. V. P বলে একটি অ-লৌকিক সংস্থা আছে, যাদের কাজ ছিল বিক্রয়বাসনাহীন জনস্বার্থের অনুকূল বিজ্ঞাপন দেওয়া। ভারতবর্ষের বিবেকের গার্জেন হয়ে তাঁরা যে ধরনের বিজ্ঞাপন দিতেন বা দেন তা হ'ল এরকম—যেমন মদ খাওয়া খারাপ, আয়কর ফাঁকি দেবেন না, সন্তান দুটির বেশী নয়, প্রত্যেকেরই সঞ্চয় করা উচিত, দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন···ইত্যাদি। এতে সাধারণ মানুষের কি উপকার হ'তো জানি না। ছোট মাঝারি পত্রপত্রিকাগুলির কিছু আর্থিক সুরাহা হ'তো। আর শুধুমাত্র চোখে দেখেই প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন জ্যোতিষীর মত D. A. V. P-র কর্মকর্তারা প্রতিটি কাগজ প্রকাশে কত খরচ হতে পারে ঝট্ করে বুঝে ফেলে, বিজ্ঞাপনের মূল্যমান কমিয়ে একটা অদ্ভুত অঙ্কে দাঁড় করিয়ে দিতেন। খবরের কাগজ যেমন কেউ বিজ্ঞাপনের জন্য পড়ে না খবরের জন্যই পড়ে, তেমনি ছোট ছোট সাহিত্য পত্রিকাগুলি মানুষ সাহিত্যের জন্যই এতকাল পড়ে আসছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে সরকার যে অর্থ বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় করেন তা আসলে একধরনের জরুরী কর্তব্যস্বীকৃত অনুদান-মাত্র। এতে সরকারের নিজেরই শ্লাঘা বোধ করা উচিত। কারণ কবি সাহিত্যিকরাই জনরুচি তৈরী করেন, নির্মাণ করেন ঐতিহ্য নামক মৌলিক মহার্ঘ দ্রব্যটি। ভারতের দুর্ভাগ্য, স্বাক্ষরতা এখনো এমন পর্যায়ে আছে, যার শতাংশ-হার অত্যন্ত নিচু স্বরে প্রায় নিষিদ্ধ শব্দের মতো লজ্জায় উচ্চারণ করতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, তথাকথিত স্বাধীনতার পর দেশের ভার এমন কিছু অপরিণামদর্শী নেতার হাতে পড়েছিল, যাঁরা বাণীকণ্ঠ হয়েই জীবন কাটিয়ে গেছেন। জনতার প্রকৃত মঙ্গল তেমন কিছু করেন নি। যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একনম্বর দাবী হওয়া উচিত ছিল খাদ্য ও প্রতিস্তরে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার প্রসার এবং তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ; তার বদলে তাঁরা আঁশকথা পাঁশকথা বলে কেবলই সময় নষ্ট করেছেন। তাছাড়া তাঁদের বোধহয় এ-ধারণাও ছিল না, পেট খালি থাকলে বর্ণপরিচয়ের প্রাথমিক অক্ষরগুলিও তেঁতো লাগতে বাধ্য। ছোট কাগজ ও তার বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে এই শিবের গীত বোধহয় প্রয়োজন ছিল।

সুতরাং ভারতের অধিকাংশ জনতা এখনো সাংবাদপত্র পড়ে না, সাহিত্য তো পড়েই না। মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আদবানীর একথা অজানা থাকার কথা নয়। হায়, তাই বোধহয় নির্দেশ দিয়েছেন দু'হাজার প্রচার সংখ্যা না হ'লে কোন লিটল ম্যাগাজিনকেই আর সরকারী উপদেশামৃতলিপ্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না। এতে প্রচারসংখ্যার দিক থেকে অদূর ভবিষ্যতে 'বিভাবে'র হয়তো খুব অসুবিধে হবে না; কিন্তু এখানে সমস্ত সৎ লিটল ম্যাগাজিনের তরফ থেকে আমরা কথা বলছি, তাই ভয়ের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পের যোগ্য মুখপত্রগুলি বন্ধ হয়ে গেলে সমূহ ক্ষতি হবে।

এ তো গেল প্রথম বাধার কথা। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এখনো কিছু সারস্বতমন শিল্প সাহিত্যের কাছের মানুষ আছেন, যাঁরা মাঝে মধ্যেই বিজ্ঞাপনের বদান্যতায় সাহায্য করতেন এই সব লিটল ম্যাগাজিন-গুলিকে। নতুন কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দেয় বিজ্ঞাপনের ওপর যে অতিরিক্ত কর প্রস্তাব করেছেন, তাতে ছোট ছোট কাগজের যত ক্ষতি হবে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে বিজ্ঞাপনশিল্পের সঙ্গে জড়িত এজেন্সী, প্রেস, ব্লকমেকার ইত্যাদি সংস্থার অসংখ্য মানুষের। এ এক অবাস্তব অবস্থা।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা নিয়েছেন। সৌভাগ্যের কথা তাঁরা এবিষয়ে অনেকটাই উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সমস্ত সরকারী বিজ্ঞাপন তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরে কেন্দ্রীকরণ করলেও তাঁরা কথা দিয়েছেন সত্যিকারের যোগ্য ছোট পত্রিকাগুলির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেই তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা রূপ দেবেন। আমরা জানি বাংলার বর্তমান যুক্ত-বাম মন্ত্রীসভার মধ্যে অনেকেই সাহিত্যপ্রাণ। তার মধ্যে অন্তত দুজন আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে গভীরভাবে সাহিত্যআসক্ত মানুষ। এঁদেরই একজনের হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন পরিকল্পনা সার্থক করার গুরুভার পড়েছে। এটাই একমাত্র ভরসার কথা। দেখা যাক বিধিনিষেধের গণ্ডী পেরিয়ে তাঁর হাত কতদূর প্রসারিত হয়।

পঙ্কজকুমার মল্লিকের পরলোকগমনে আমরা গভীর শোকাহত। যেন রবীন্দ্রনাথেরই দ্বিতীয় মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ গান লিখে সুরারোপ করেছিলেন। কিন্তু পঙ্কজকুমারই সম্ভবত প্রথম রবীন্দ্রগানের অসাধারণ সম্ভাবনা আবিষ্কার করে তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত করে তোলেন।

কিছুদিন আগে আতাউর রহমানও পরলোকগমন করেছেন। এই নগরীর সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল নিবিড়।

বিভাবের এ-সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হ'লো। মাঝে অবশ্য গত দু'বছরের বিভাবের নির্বাচিত প্রবন্ধ নিয়ে একটি ছোট অফ-প্রিণ্ট ধরনের পুস্তিকা বে'র হয়েছিল। সেটা গ্রাহক ছাড়া আর কাউকে দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে লজ্জিত। আমরা আরো দু-তিনশো-গ্রাহক নেবো। যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁদের এ সংখ্যা থেকেই হতে হবে।

আমাদের পূর্বঘোষিত বিশেষ "দিলীপ গুপ্ত" সংখ্যাটি সম্পাদনা করবেন কবি নরেশ গুহ ও কবি অরুণকুমার সরকার। সংগঠনে থাকবেন বাংলা সাহিত্যের আর একজন কাছের মানুষ নৃপেন্দ্র সান্যাল। প্রকাশিত হবে এ বছরের মাঝামাঝি কোন সময়ে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সৌজন্য সংখ্যা

সূচীপত্র

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিশেষ যুগ্ম-সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৮৫।

প্রবন্ধ

হরিনাথ দে। রাধারমণ মিত্র ১৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ। সুশীল রায় ৩৯
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ
ও তার প্রতিকার। সুপ্রিয়কুমার ভট্টাচার্য ৪৯

কবিতাগুচ্ছ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮২
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একগুচ্ছ কবিতা। ৮৫

প্রবন্ধ

ব্রাহ্মণদের গৃহগমন। গুণানন্দ ঠাকুর ৮৮

বাণিজ্যচিন্তা

উৎপাদনশীলতা ও মানবিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে
সামনের সারির তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা। রণজিৎ গুহ ৯২

শিল্পভাবনা

শিশিরকুমার। অমলকৃষ্ণ গুপ্ত ৯৬

ব্যক্তিগত রচনা

সাদা ও সিধে। কবিতা সিংহ ১০৪

কবিতাগুচ্ছ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। সুরজিৎ ঘোষ ১০৮
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একগুচ্ছ কবিতা ১১৫

বিশেষ রচনা

"কি পড়ি"। লিখেছেন : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ ১১৮

ব্যক্তিগত রচনা

চতুঃসপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে। অন্নদাশঙ্কর রায় ১২৯

কবিতাগুচ্ছ

স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতা। প্রণবকুমার নাগ ১৩২
স্নেহাকর ভট্টাচার্যের একগুচ্ছ কবিতা। ১৪১

আলোচনা

ভারত-শ্রমজীবী। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৯

চিঠিপত্র

রিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্ত চক্রবর্তী, তুলসী মুখোপাধ্যায়, স্তপন চট্টোপাধ্যায়, রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নাকুমার সেন, তরুণকুমার গুপ্ত, সুনীল মিত্র। ১৫৭

কার্যকরী সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক মণ্ডলী : পবিত্র সরকার। প্রদীপ দাশগুপ্ত।
কবিরুল ইসলাম। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা-৭০০০১৭
প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ
কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়েন্ট প্রোসেস

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলি-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং রাজধানী প্রিন্টিং, ১১৭/১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২ এবং 'রূপলেখা' ২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

হরিনাথ দে

রাধারমণ মিত্র

আমি হরিনাথ দের জীবনী লিখতে বসিনি। ছয় সাত মাস আগে হরিনাথ দের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হোল। সেই উপলক্ষ্যে, দেরীতে হলেও, এই লেখা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন। আমি এখানে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের ঘটনাবলীর মাত্র রূপরেখা দেব। আমার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁর পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল ও তাঁর নিজের পুত্রকন্যার এবং তাঁর পিতার আশ্রয়দাতা ভঞ্জদের বংশ-লতিকা দেওয়া যা এর আগে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

হরিনাথ দের পিতা ছিলেন ভূতনাথ দে। ভূতনাথ দের পিতামাতার নাম কেউ জানে না। তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল তাও অজানা। অনুমান করা হয় যে তাঁর নিবাস ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহড়ু (বড়ু) গ্রামে কিংবা তারই কাছাকাছি আর কোন গ্রামে। বহড়ু গ্রাম বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা লাইনে, উত্তরে দক্ষিণ বারাসাত ও দক্ষিণে জয়নগর-মজিলপুরের মধ্যে অবস্থিত। বহড়ু গ্রাম কায়স্থ প্রধান গ্রাম। এখানে বসু, মিত্র, ভঞ্জ ইত্যাদি উপাধিধারী কুলীন ও মৌলিক কয়েকটি কায়স্থ বংশের বাস।

বহড়ুগ্রামের জমিদার বংশের আদিপুরুষ ছিলেন দেওয়ান নন্দকুমার বসু। প্রথম জীবনে তিনি স্বনামধন্য রামদুলাল সরকারের সঙ্গে "শিপ্-সরকার" ছিলেন। পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে পর পর কাশিমবাজার রেশমকুঠি, পাটনা আফিমকুঠি ও কলকাতার কাস্টমস্ হাউসের দেওয়ান হন। দেশের বাড়িতে এক অপূর্ব কারুকার্যময় মন্দিরে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনে কৃষ্ণচন্দ্র

সিংহ ওরফে লালাবাবুর মতো বৃন্দাবনবাসী হন। বৃন্দাবনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের নতুন মন্দির তৈরী করে দেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনেই তিনি দেহরক্ষা করেন। নন্দকুমারের বংশে জন্মান রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু। তিনি একাধারে নাটক রচয়িতা ও দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৫. ৬. ১৯১৯। তাঁর পুত্র জানকীনাথ বসুও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কলকাতার •মানিকতলা স্ট্রীটে বৈকুণ্ঠনাথ বসুর বাড়ির দক্ষিণ অংশ কিনে সেই জমিতে বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ৺যতীন্দ্রনাথ মৈত্র নিজের বাড়ি তৈরী করেন

হরিনাথ দের পিতা ভূতনাথ দে-র প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। বহড়ু গ্রামের দ্বিতীয় বিখ্যাত বংশ হচ্ছে ভঞ্জ বংশ। এরা দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থদের বাহাত্তর ঘরে (৭২ ঘরের) মৌলিক কায়স্থ। এই বংশের দ্বারকানাথ ভঞ্জ দয়াপরবশ হয়ে বালক ভূতনাথকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে পুত্রের মতন মানুষ করেন। কি সূত্রে ভূতনাথের সঙ্গে দ্বারকানাথের পরিচয় হয় তা জানা যায় না। ভূতনাথ ছিলেন দ্বারকানাথের চেয়ে ২২ বছরের ছোট। ভূতনাথের বাল্য ও যৌবনের খানিক অংশ প্রথমে বোধহয় বহড়ু গ্রামে, পরে কলকাতায় ভঞ্জদের বাড়িতেই কাটে। দ্বারকানাথ ভঞ্জ কলকাতায় ১০ নম্বর রঘুনাথ চাটুজ্জে স্ট্রীটে ইং ১৮৫৪ সালে বাড়ি করেন। এই বাড়ি থেকেই ভূতনাথের বিবাহ হয় উত্তর-চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহ গ্রামের উমাচরণ মিত্রের ছোট মেয়ে এলোকেশীর সঙ্গে। রঘুনাথ চাটুজ্জ্যে স্ট্রীটের বাড়িতে দ্বারকানাথের বংশধরেরা এখনো বাস করছেন।

দ্বারকানাথ ভঞ্জের ছোট ভাই হরনাথ ভঞ্জ লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন। "স্বরলোকে বঙ্গের পরিচয়" এই নামে দুই খণ্ডে এক বই লেখেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮২ সালে।

ভূতনাথ দে ওকালতি পাশ করে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গিয়ে ওকালতি শুরু করেন। তিনি কালক্রমে সেখানে পাবলিক প্রসিকিউটর ও গভর্ণমেণ্ট প্লিডার হন। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধি দেন। রায়পুরে তাঁর সঙ্গে আইন ব্যবসা করতেন দুজন ব্যারিষ্টার—(১) তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি প্রিয়ংবদা দেবীর স্বামী ও ব্যারিষ্টার শ্রীশংকরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যাঠা এবং (২) প্যারীচরণ সরকারের মেজ ছেলে যোগেন্দ্রনাথ সরকার। সেই সময়ে রায়পুরের পাশের জেলা বিলাসপুরে এটর্নীগিরি করতেন স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত।

রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে ১৯০০ সালে ৫৫ বছর বয়সে ওকালতি ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন এবং ৩০ নং বাহির মির্জাপুর রোডে স্ত্রীর নামে বাড়ি তৈরী করে বাস করেন। তিনি রায়পুরে থাকতেই সেখানে একটি বাড়ি তৈরী করেছিলেন। দেওঘরেও একটা বাড়ি ছিল তাঁর। কলকাতার পৈতৃক বাড়িতেই হরিনাথ দে বাস করেন ১৯০৭ সালের শেষ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। হরিনাথের মৃত্যুর ২।৩ বছর পরেই তাঁর মা এলোকেশী দেনার ভয়ে এই বাড়ি বিক্রী করে দেন। এই বাড়িতে পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮।১০ বছর ভাড়া ছিলেন এখন বাড়ির নম্বর হচ্ছে ৩১নং ও রাস্তার নাম হয়েছে হরিনাথ দে রোড, যদিও বাড়ির প্রবেশদ্বার ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীটের ওপর। বর্তমানে এই বাড়ির মালিক হচ্ছেন "কালিকা টাইপ ফাউন্ড্রি" নামের বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

হরিনাথ দের মা বিদুষী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষা ছাড়া ইংরেজী, হিন্দী ও মারাঠি ভাষা জানতেন। কিন্তু তিনি পুত্রের প্রতি তত সদয় ছিলেন না। তিনি বেশীরভাগ সময় হয় রায়পুরের বাড়িতে অথবা দেওঘরের বাড়িতে বাস করতেন।

হরিনাথ দে কলকাতার পৈতৃক বাড়িতে বাস করতে যাবার আগে প্রায় আড়াই বছর আরেকটি বাড়িতে বাস করেছিলেন। সেটা হচ্ছে ৭৮ ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়ি। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হয়ে আসেন ৮ ২ ১৯০৫ তারিখে। ওইদিন থেকে ১৯০৭ সালের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি এই বাড়িতে বাস করেছেন। এই বাড়িতেই বিখ্যাত রুশদেশীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত F. I. Stcherbatsky ও চীনা উপপ্রধানমন্ত্রী হরিনাথ দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হরিনাথ দে এখান থেকে চলে যাবার পর এই বাড়িতে থাকেন ঢাকা জেলার মালখানগরের সত্যানন্দ বসু (ঠাকুর)।

১৮৯৫ সালে হরিনাথ দে শরৎশোভা বসুকে বিবাহ করেন। শরৎশোভার পিতা ছিলেন কলিকাতা গরানহাটার বসু বংশের নন্দলাল বসু ও মা ছিলেন কবি-সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ ঘোষের (হেঁদোর উত্তর ধারে প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ির মালিক) বংশধর গয়াপ্রসাদ ঘোষের ভগ্নী। গয়াপ্রসাদ হরিনাথ দের মামাশ্বশুর হলেও অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অভিন্ন সঙ্গী ছিলেন। হরিনাথ দের শ্বশুর গ্রীক সওদাগরী অফিসে পেটো-কোচিনোর খাজাঞ্চী ছিলেন। কানে কালা ছিলেন বলে লোকে তাঁকে বলতো কালানন্দ। তিনি ১০নং বকুল বড়াল স্ট্রীটে বাড়ি করেছিলেন।

এবার সংক্ষেপে হরিনাথ দের জীবনকথা বলা যাক :

১২.৮.১৮৭৭ তারিখে আড়িয়াদহ গ্রামে মামার বাড়িতে হরিনাথের জন্ম। বছরখানেক মামার বাড়িতেই থাকেন। তারপর মা তাঁকে রায়পুরে বাবার কাছে নিয়ে যান। তখন রেল হয়নি, গরুর গাড়ীতে করে যেতে হতো। সে যাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবীও এলোকেশীর সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি যাচ্ছিলেন বিলাসপুরে স্বামী বিশ্বনাথ দত্তের কাছে।

হরিনাথ দের প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে। তারপরে রায়পুরে মিশন স্কুলে। তিনি অঙ্কে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বরাবরই কাঁচা ছিলেন। ১৮৭৭ সালে রায়পুরের নর্মাল স্কুল থেকে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর সেখানকার সরকারী হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯০ সালে ওই স্কুল থেকে মিডল স্কুল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে ছাত্রবৃত্তি পান। ১.৫.১৮৯১ তারিখে কলকাতা সেন্ট জেভিয়ারস্ স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয়। সেই সময় পিতা তাঁকে রিপন স্ট্রীটে Mc Graw নামে এক সাহেবের কাছে রাখেন। ১৮৯২ সালে সেন্টজেভিয়ারস্ স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

১৮৯৪—সেন্টজেভিয়ারস্ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এফ. এ পাশ করে একটা সাধারণ স্কলারশিপ ও ভাষায় প্রথম হওয়ায় ডাফ স্কলারশিপ পান।

১৮৯৬—প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় দুই বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে পাশ করেন। ল্যাটিন অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও ইংরেজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। মাসিক চল্লিশ টাকার একটি ছাত্র বৃত্তি পান।

ওই বছরেই প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাটিন ভাষায় এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন ও একটি স্বর্ণপদক পান। তিনি ওই বিষয়ে এত নম্বর পেয়েছিলেন যে সে পর্যন্ত আর কেউ তত নম্বর পায় নি।

১৮৯৭ :

এপ্রিল মাসে বিলেত যান।

জুলাই মাসে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন।

১৫ই নভেম্বর বিলেত থেকে বিশেষ অনুমতি পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাষায় পরীক্ষা দেন। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ও স্বর্ণপদক পান। অধ্যাপক টনি সাহেব তাঁর পরীক্ষক ছিলেন।

প্যারিসে Sorborne বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত এ্যাসিরিও ভাষার পণ্ডিত J. Menant-এর তত্ত্বাবধানে এ্যাসিরিও ভাষা অধ্যয়ন করেন।

১৮৯৮ :

ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বছরে ২০০ পাউণ্ড হিসাবে তিন বছরের জন্য State Scholarship দেন।

কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনার জন্য চ্যানস্‌লারের স্বর্ণপদক পুরস্কার পান।

ইজিপ্টে কিছুদিন থেকে উচ্চ আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। জর্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা শিক্ষার আধুনিক প্রণালী শিক্ষা করেন।

১৮৯৯—ক্রাইস্ট কলেজ, কেম্‌ব্রিজের সিনিয়র ক্ল্যাসিকাল স্কলার নির্বাচিত হন।

১৯০০—কেম্‌ব্রিজের ক্যাসিকাল ট্রাইপসের প্রথম ভাগ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক কাওএলের কাছে সংস্কৃত ও অধ্যাপক বেভান ওরিউর কাছে আরবী ভাষা অধ্যয়ন করেন।

১৯০১ :

কেম্‌ব্রিজের মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাসমূহের ট্রাইপস পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করেন।

ইংরেজী সাহিত্যে স্কীট পুরস্কার পান।

অধ্যাপক বেভন, রিউর ও কান্তয়েল তাকে এ্যালেন গবেষণা ছাত্রবৃত্তির জন্য সুপারিশ করেন।

গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন।

১লা ডিসেম্বর – ভারতের সেক্রেটারী অফ স্টেট তাঁকে ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে নিযুক্ত করেন।

৭ই ডিসেম্বর—ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন।

৩.৬.১৯০৩—কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্য নির্বাচিত হন।

৮.২.১৯০৫—ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগ দেন।

সংস্কৃত, আরবী ও ওড়িয়া ভাষায় হাই প্রফিসিয়ান্সি পেয়ে যথাক্রমে ২০০০৲, ২০০০৲ ও ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও মুসলিম ইন্‌স্টিটিউটের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯০৬ — বর্ধমানের মহারাজার দোভাষী হয়ে দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রা।

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিতে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

৬ই নভেম্বর—অধ্যক্ষরূপে হুগলী কলেজে যোগ দেন।

১৯০৭ :

২৩শে ফেব্রুয়ারী :

কলকাতার Imperial Library-র লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ইনি দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিক। প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহকারী গ্রন্থাগারিক জন ম্যাকফারসন্ (১৯০৩-১৯০৬)। এপ্রিল—কলকাতা হিস্টোরিকাল সোসাইটি council-এ (পরিষদে) নির্বাচিত হন।

আরবি ভাষায় ডিগ্রি অফ অনার প্রথম বিভাগে পাশ করে ৫০০০্ টাকা পুরস্কার পান।

১৯০৮ :

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যে 'এ' ও 'ই' গ্রুপে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রত্যেক গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। ৯. ৩. ১৯১১—তারিখে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পরিচালক-সভা তহবিল তছরূপ, কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি ১৪ দফা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনেন। ৬ ৫. ১৯১১ তারিখে তিনি ঐ অভিযোগগুলির উত্তর দেন। লাইব্রেরীর পরিচালক সভার চার জন সদস্যের উপর ঐ উত্তর পরীক্ষা করার ভার দেওয়া হয়। এই চার জন ছিলেন—কলকাতার লর্ড বিশপ (প্রেসিডেন্ট), জজ স্যার আশুতোষ মুখার্জী, মিঃ এ. আর্ল ও ডঃ এডওয়ার্ড ডেনিসন্ রস্। সর্বসম্মতিক্রমে হরিনাথকে কর্মচ্যুত (ডিস্‌মিস্) করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদ থেকে ও ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্‌ভিস্ থেকে বরখাস্ত হন।

১৫. ৮. ১৯১১ তারিখে হরিনাথের টাইফয়েড হয়। নীলরতন সরকার, প্রাণধন বোস প্রমুখ কলকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁর চিকিৎসা করেন। তাঁদের সব চেষ্টা বিফল হয়। ৩০ ৮. ১৯১১ তারিখে হরিনাথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই দিনই নিমতলা শ্মশানে তাঁর দেহ দাহ করা হয়। একজন দিক্‌পালের পতন হলো, কিন্তু কলকাতার লোকে টেরই পেলনা। কলকাতা বা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুর মুখে একটু শোকের চিহ্ন বা চোখে একফোঁটা জল দেখা গেল না।

কিন্তু এরকম লোক মরেও মরেন না। হরিনাথ দে অমর। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্‌রূপে চিরকাল ভারতবাসীর স্মরণে থাকবেন। তিনি মাত্র ৩৪ বছর বেঁচে ছিলেন। এই ৩৪ বছরের মধ্যে তিনি ৩৪টি ভাষা ভালো করে শিখেছিলেন। সেই ভাষাগুলি হল :

ইউরোপীয়ান ভাষা

গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, ওল্ড ফ্রেঞ্চ, প্রভেঁসা, পর্তুগীজ, রুমানিয়ান, ডাচ্, ড্যানিশ, এ্যাংলো-স্যাক্‌সন, গথিক, ওল্ড এবং মিড্‌ল হাই জার্মান, ইংরাজী (১৬)।

এশিয়াটিক ভাষা

সংস্কৃত, পালি, আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি, হিব্রু (বিব্‌লিক্যাল), চীনা (ক্ল্যাসিক্যাল), তিব্বতী (ক্ল্যাসিক্যাল), তুর্কী, জেন্দ, জাপানী, বর্মী, সিংহলী, (১৮)।

আমার মনে হয় একটি ভাষা উপরের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে—সেটি আরমেনিয়ান ভাষা। হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বোর্ড অফ্ স্টাডিজ-এর সদস্য ছিলেন—গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, উর্দু ও আর্মানি। অথচ উপরের দুটি ভাষার তালিকার কোনটাতেই আর্মানি ভাষার নাম নেই। এই ভাষাটিকে যোগ দিলে হরিনাথ দে মোট ৩৫টি ভাষা জানতেন।

এখানে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু ভাষাবিদ্‌দের অন্ততঃ কয়েকজনকে স্মরণ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইউরোপের—Leilenitz (গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক), William Von Humboldt, Baron Von Bunsen, Cardinal Mezzofanti, Jonadal (মরক্কোর ইহুদী) Piccodella Mirandola, Niebhur, Sir John Bowring, Elihu Burrit, Sir William Rowan Hamilton, এবং সেই সব জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয়, ও রুশীয় পণ্ডিত যাঁরা প্রধানতঃ সংস্কৃতজ্ঞ বা প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ বলে পরিচিত। এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই শুধু সংস্কৃতই জানতেন না,

সংস্কৃত ছাড়া আরবী, ফার্সী, ইত্যাদি অনেক এশীয় বা প্রাচ্য ভাষাও জানতেন। তাঁদের সংখ্যা এত বেশী যে প্রত্যেকের নাম করতে গেলে তালিকা প্রকাণ্ড হবে। সুতরাং আমি তাঁদের নাম এখানে দিলাম না।

এইসব প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজন ভারতবর্ষে এক বা একাধিকবার এসেছেন, কিছুদিন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, বা কোন কোন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তারপর আবার স্বদেশে ফিরে গেছেন।

আবার কতকগুলি ইউরোপীয় মিশনারী ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসে দীর্ঘকাল এদেশে বাস করে গেছেন—কেউ কেউ এদেশের মাটিতেই দেহরক্ষা করেছেন। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা শিখে এদেশে এসেছিলেন ও এদেশে দীর্ঘকাল থাকার ফলেই হোক্ অথবা এদেশীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের তাগিদেই হোক্, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন।

প্রথমে এসেছিলেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত জেসুইট্ পাদ্রীরা। প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারত তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল। তাঁরা সংস্কৃত ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষা শিখেছিলেন। এঁদের কয়েকজনের নাম নামমাত্র এখানে উল্লেখ করলাম—Robert de Nobili, R. C. Beschi, Heinrich Nolh, Hauxladen, Jean Philippe Werdin, (ইনি Father Paulinus নামে বেশী পরিচিত), Antequil Du Perron ও Rask (Rasmus Christen)।

এঁদের পরে এলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট মিশনারীরা। এঁদেরও কর্মক্ষেত্র প্রথমে ছিল দক্ষিণ ভারত, তারপর হয় উত্তর ভারত। দক্ষিণ ভারতের বড় তিনজন মিশনারী Schwartz (বা Schwarz), Ziegenbalg ও Caldwell এবং উত্তরভারতের শ্রীরামপুরের William Carey, Joshua Marshman, Felix Carey, ও William Yats। এই চারজনই ব্যাপটিস্ট পাদ্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভারতীয় ভাষা শিখেছিলেন উইলিয়ম কেরী। আর একজন ছিলেন বিশপ্স্ কলেজের অধ্যক্ষ Dr. Mills। ইনি ছিলেন এ্যাংলিকান পাদ্রী।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারীরাও পিছিয়ে রইলেন না। তাঁরাও সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শিখলেন—যেমন Nathaniel Brassy Halhead, তাঁর ভাইপো (তাঁর নামও Nathaniel Brassy Halhead), Sir Charles Wilkins, Henry Thomas Colebrooke, Horace Hayman Wilson, Sir William Jones, E. B. Cowell John

Beams। এঁদের মধ্যে Sir William Jones সবচেয়ে বেশী প্রাচ্য ভাষা শিখেছিলেন।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির তিনজন সদস্য Francis Wilford, Dr. John Leyden ও Csoma de Korös (হাঙ্গেরীয়) অনেকগুলি প্রাচ্য ভাষা শিখেছিলেন।

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকদের সকলেই ও ছাত্রদের অনেকেই বহু প্রাচ্য ভাষায় প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, যেমন, Gilchrist, Edmonstone, Malcolm, Macnaughten, Jenkins, Bayley, Lumsden, James Princep, John Herbert Harrington ও F. A. Gladwin।

কলকাতা মাদ্রাসার কয়েকজন অধ্যক্ষও বহু প্রাচ্য ভাষা জানতেন—যেমন, Dr. Aloys Sprenger, M. B, William Nassau Lees, Blochman, Hoernle, Denison Ross।

বাঙালীদের মধ্যেও কয়েকজন অনেকগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন, যেমন, রামমোহন রায়, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা রাধাকান্ত দেব, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নীলরত্ন হালদার, আনন্দকৃষ্ণ বসু, প্রিয়নাথ সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রবি দত্ত, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি।

উপরে যেসব বহুভাষাবিদ্দের নাম করা হল তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্ হলেন ইতালিদেশীয় রোমান ক্যাথলিক Giuseppe Mezzofanti (১৭৭৪-১৮৪৯)। তিনি ৭৫ বছর বেঁচে ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি নাকি সবসুদ্ধ ১১৪টি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন ও একমতে ৭৮টি ভাষা ও অন্যমতে ৫৮টি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। হরিনাথ দে মাত্র ৩৪ বছর বেঁচে ছিলেন। তার মধ্যেই তিনি ৩৫টি ভাষা ভালোরকম আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি যদি মেজোফ্যান্টির মতো ৭৫ বছর বাঁচতেন তাহলে তিনি সবসুদ্ধ কতগুলি ভাষা শিখতে পারতেন তা ঠিক বলতে পারা না গেলেও অনুমান করতে বাধা নেই। Jonadal ২৮টি ভাষা জানতেন। Picco dela Mirandola ১৮ বছর বয়সে ২২টি ভাষা শিখেছিলেন।

Sir William Jones মোট ২৮টি ভাষা জানতেন। তারপর Nibhur, Sir John Bowring, Elihu Burrit ও Csoma de Korös প্রত্যেকে ১৮

থেকে ২০টি ভাষা জানতেন। Dr. John Leyden জানতেন ২০টি ভাষা। আয়ারল্যাণ্ডে Sir William Rowan Hamilton (১৮০৫-১৮৬৫) ১৩ বছর বয়সে ১৩টি ভাষা শিখেছিলেন আর ১৭ বছর বয়সে একজন উঁচুদরের গণিতজ্ঞ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে ছাত্র থাকাকালীন ১৮২৭ সালে ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ও আয়ারল্যাণ্ডে রাজকীয় জ্যোতিষী নিযুক্ত হন।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে মিরাণ্ডোলা ও রাওয়ান হ্যামিল্টন্, হরিনাথ দে-র চেয়েও বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁদের কেউই মোট ভাষা হরিনাথ দে'র চেয়ে বেশী শেখেননি।

বাঙালী ভাষাবিদ্‌দের মধ্যে কে কতো ভাষা শিখেছিলেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। আমি কয়েকজনের মোটামুটি একটি হিসাব দাঁড় করিয়েছি। অন্যদের বেলায় কোনো হিসাবই পাইনি। আমার হিসেবে কিছু ভুল থাকা অসম্ভব নয়।

হরিনাথ দে'র পরেই নাম করতে হয় অমূল্যচরণ (ঘোষ) বিদ্যাভূষণের। তিনি মোট ২৬টি ভাষা জানতেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা। তিনি মোট কটা ভাষা জানতেন জানি না। তবে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের চেয়ে বেশী না জানলেও, নেহাৎ কম জানতেন না বলে আমার ধারণা। রামমোহন রায় ৭টি, রেভা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০টি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র অন্ততঃ ১০টি, মাইকেল মধুসূদন ১৩। ১৪টি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮টি, আনন্দকৃষ্ণ বসু ৯টি ভাষা জানতেন। প্রিয়নাথ সেন ও রবি দত্ত প্রত্যেকে কতগুলি ভাষা জানতেন তার হিসেব কোথাও নেই। সৈয়দ মুজ্‌তবা আলি নাকি ১৫টি ভাষা জানতেন। আর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কতগুলি জানতেন তা বলা শক্ত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভাষাজ্ঞানে কার্ডিনাল মেজ্জোফ্যান্টির পরেই হরিনাথ দে স্বদেশী ও বিদেশী ভাষাচার্যদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন।

হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্‌ট্রান্স থেকে এম. এ. পর্যন্ত পরীক্ষায় গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, পালি, ইংরেজী, আরবী ও ফরাসী ভাষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন।

৩৪ বছর বয়সের মধ্যে ৩৫টি ভাষা শিক্ষা করা অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছাড়া

সম্ভব নয়। তাঁর স্মৃতিশক্তি শুধু অসাধারণই নয়, সত্যই অবিশ্বাস্য ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অভিধান ২।৩ বার পড়লেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। যে কোন সময়ে সেই সব অভিধান পাতার পর পাতা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। একবার যা পড়তেন, ভুলতেন না। একটা সম্পূর্ণ নতুন ভাষার ব্যাকরণ এক থেকে দু' ঘণ্টার মধ্যে পড়ে শেষ করতে পারতেন। আর তাঁকে কখনও সে ব্যাকরণের পাতা উল্টাতে হতো না। আর যে ভাষা শিখতেন সেই ভাষা নাকি সেই দেশের লোকের মতো বলতে পারতেন। কেউ ধরতে পারতো না যে তিনি বিদেশী কিংবা সেই ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়। এক একটা নতুন ভাষায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়েছেন ২।৩ মাসের মধ্যে। যতই শক্ত ভাষা হোক্, সেই ভাষায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিতে তাঁর ছ' মাসের বেশী সময় লাগেনি।

অনেকে অনুযোগ করে থাকেন—তিনি তো এত ভাষা শিখলেন, এত পড়লেন, এত জানলেন, কিছু মৌলিক রচনা তো কিছু রেখে গেলেন না আমাদের জন্য। তার উত্তর এই—দেশ-বিদেশের ৩৪। ৩৫টি ভাষা আয়ত্ত করতেই তো মাত্র ৩৪ বছর কেন, একটা সুদীর্ঘ জীবনেও কুলোয় না। তিনি মাত্র ৩৪ বছরে, স্বল্পায়ু জীবনে এই অসাধ্য সাধন করেছেন। এই ৩৪। ৩৫টি ভাষা শিক্ষা ছাড়া তিনি যদি আর কিছু নাও করতেন, এক লাইন নাও লিখে যেতেন, তাতেও আমাদের বলবার কিছু থাকতো না। কিন্তু তিনি লেখালেখির দিক থেকেও কিছু কম কাজ করে যাননি। আমি মাত্র তাঁর প্রধান কতকগুলি কাজের কথা এখানে উল্লেখ করছি।

তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সম্পাদনা করেছেন। যেখানে আবশ্যক হয়েছে নিজে টীকা, টিপ্পনী যোগ করেছেন। (১) লঙ্কাবতারসূত্র (২) নির্বাণ ও ব্যাখ্যাশাস্ত্রম্ (৩) সুত্তপিটক্, খুদ্দকণিকা (৪) তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গীয়্ (৫) শাহ-আলম্-নামা (৬) মেকলের মিল্‌টনের উপর প্রবন্ধ (৭) মেকলের গোল্ডস্মিথের জীবনী (৮) স্যার ওয়াল্টার স্কটের 'ওয়েভার্‌লি' উপন্যাসগুলি থেকে চয়নিকা।

তাছাড়া বিভিন্ন ভাষা থেকে তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন অনেক। কয়েকটির উল্লেখ করছি :

(১) নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকার পঞ্চম অধ্যায়, আচার্য কুমারজীবের মূল চীনা ভাষা থেকে অনুবাদ।

(২) নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকা-র ষড়বিংশ অধ্যায়ের আচার্য কুমারজীবের চীনা ভাষা থেকে অনুবাদ।

(৩) সুত্তপিঠক খুদ্দকণিকায় থেরিগাথা 'সুভার প্রলোভন'।

(৪) তারানাথের ভারতে বুদ্ধধর্মের ইতিহাস। মূল তিব্বতী ভাষা থেকে অনুবাদ।

(৫) সুত্তনিপাতের ধনিয়াসুত্ত ছন্দে অনুবাদ।

(৬) ইবন্ বটুটা আরবী থেকে "বাংলার বর্ণনা"-র অনুবাদ।

(৭) হাফেজ্-এর ফার্সী থেকে "সুলতান গিয়াসউদ্দিনের প্রতি" কবিতার অনুবাদ।

(৮) কাশীদাসের শকুন্তলা প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের ছন্দে অনুবাদ।

(৯) পুস্কিনের গল্পের রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ।

(১০) লারমণ্টফের কবিতা রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ।

(১১) লেপার্ডির কবিতার মূল ইতালীয় ভাষা থেকে অনুবাদ।

(১২) বেনেঘিলের কবিতার ফরাসী ভাষা থেকে অনুবাদ।

এছাড়া বিদ্যাপতির অনেক বিখ্যাত পদ তিনি অনুবাদ করেছেন।

অমৃতলাল বসু, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পদ্মজিনী বসু, রানী মৃণালিনী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর বাংলা থেকেও তিনি অনেক অনুবাদ করেছেন। অমৃতলালের "বাবু", বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্", মাইকেলের "আশার ছলনে ভুলি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া দা ফানো নামে একজন ইতালিয় সন্ন্যাসীর সংগৃহীত তিব্বতী-ল্যাটিন শব্দকোষ, সুবন্ধুর বাসবদত্তার অনুবাদ ও সুবন্ধুর কাল-সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।

পলগ্রেভের "গোল্ডেন ট্রেজারি"র উপর ও ওয়েবের "কবি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ" থেকে নির্বাচিত কবিতাবলীর উপর তাঁর নোট্ বা টীকাও উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং উপরের তালিকার উপর চোখ বোলালে এ অভিযোগের কোন ভিত্তি থাকে না যে, হরিনাথ ভাষাশিক্ষা ছাড়া আর কিছুই করেননি।

ঢাকা কলেজে, প্রেসিডেন্সী কলেজে ও হুগলী কলেজে হরিনাথের কাছে ইংরেজী সাহিত্য পড়েছেন এমন ছাত্রের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তাঁর কাছে বিভিন্ন ভাষা শিখেছেন এমন ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। এদিক থেকে ব্যারিস্টার অরুণ সেন ছিলেন তাঁর প্রধান ছাত্র। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত, অন্যদিকে তেমনি ছিল তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার অসামান্য জ্ঞান। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিতকলার প্রথম অধ্যাপক। তাঁর

ও আমার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল ৪০ বছরেরও উপর। তিনি মারা গেছেন ৮.৩.১৯৬৮ তারিখে ৮১ বছর বয়সে। শ্রীমান সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বাংলা ভাষায় হরিনাথ দে'র জীবনী লিখেছেন তাঁকে আমি-ই অরুণ সেনের কাছে নিয়ে যাই। অরুণ সেন হরিনাথ দে'র কাছে মাত্র ২টি ভাষা শিখেছিলেন··· গ্রীক ও ল্যাটিন। এই দুই ভাষায় তাঁর হাতেখড়ি হয় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক জার্মান অধ্যাপকের কাছে আর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় হরিনাথ দে'র কাছে। তাঁর কাছ থেকে হরিনাথ দে সম্বন্ধে এতো গল্প শুনেছি যে তা লিখতে গেলে একটা ছোটখাটো বই হয়ে যাবে। সুতরাং তা থেকে বিরত রইলাম। অরুণ সেনকে বাদ দিলে হরিনাথ দে-র কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। হরিনাথ প্রসঙ্গে তাই তাঁর নাম উল্লেখ করলাম।

এতক্ষণ পণ্ডিত হরিনাথ দে সম্বন্ধে বললাম। এখন মানুষ হরিনাথ সম্বন্ধে কিছু বলি।

হরিনাথ লম্বায় মাঝারী ধরনের ছিলেন। মুখ গোল ও ভরাট। মাথাটা খুব বড়। ঘাড় সহজে ফিরাতে পারতেন না। ধীরে ধীরে হাঁটতেন। মুখের মধ্যে একটা ছেলেমানুষী ভাব ছিল। বাইরে থেকে তাঁকে গম্ভীর দেখালেও তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন না, খুব ফুর্তিবাজ ছিলেন। ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে কত রকমের রগড়, রঙ্গ ব্যঙ্গ, হাসি ঠাট্টা, হৈ হুল্লোড়, এমনকি জড়াজড়ি করে নাচানাচি পর্যন্ত করতেন। সে অবস্থায় তাঁকে দেখলে কেউ মনেই করতে পারতো না যে তিনি এতো বড় পণ্ডিত। মস্তিষ্কের চর্চা করে তিনি মস্তিষ্কসর্বস্ব হননি। তাঁর অন্তরকে তাজা ও সরস রেখেছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হতো প্রয়োজনের খাতিরে। নিজে থেকে তিনি তাঁদের সঙ্গ চাইতেন না। তাঁর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল। তারা অতি সাধারণ মানুষ, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। লেখাপড়া তাদের ছিল যৎসামান্য। অসাধারণ হয়েও তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে অতি সাধারণভাবে মেলামেশা করতে পারতেন। বেশভূশার পারিপাট্য, বাহ্য চালচলন কিছুই ছিল না। বাড়িতে সাদা মোটা ধুতি ও চটিজুতা পরে থাকতেন। অনেকসময় খালি গায়ে ও খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটতেন।

তাঁর দানের সীমা ছিল না। কিন্তু দান করতেন গোপনে। কেউ টের পেতোনা। তাঁর কাছে চেয়ে কেউ কোনদিন খালি হাতে ফিরে যায়নি। ছাত্রদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কতো ছাত্রকে সাহায্য করতেন তার ইয়ত্তা নেই।

সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল না। মারপ্যাচ বুঝতে পারতেন না। সরল মনে সকলকেই বিশ্বাস করতেন। কাউকেই সন্দেহ করতে পারতেন না।

তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। আগেই বলেছি মা তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন না। অথচ তিনি মাকে খুবই ভালোবাসতেন। দাম্পত্যজীবনও সুখের ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গেও বনিবনা হতো না। তাই সান্ত্বনা খুঁজতেন মদ ও কবিতায়। ভাষার চেয়েও কবিতা তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি জন্মকবি ছিলেন। তাই অজস্র কবিতা বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। শুধু ইংরেজীতে নয়, বাংলাতেও।

হয়তো কবি হরিনাথকে, সাহিত্যিক হরিনাথকে লোকে ভুলে যাবে। কিন্তু ভুলবো না ভাষার যাদুকর হরিনাথকে। কতযুগ পরে বাংলার মাটিতে এক হরিনাথ জন্মেছে, আবার কতযুগ পরে এই মাটিতে আর এক হরিনাথ জন্মাবে কে জানে। জন্মাতে নাও পারে। হরিনাথ প্রকৃতির এক অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। এরকম সৃষ্টি বারেবারে হয় না।

ভূতনাথ দে'র শ্বশুরবংশ

উমাচরণ মিত্র (আড়িয়াদহ ২৪ পরগণা) সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন।

- কন্যা মুক্তকেশী = শোভাবাজার রাজবাড়ির উদয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর
- কন্যা এলোকেশী ১৮৫৬-১৯৩৬ = রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে ১৮৪৫-১৯০৩
- পুত্র কালীপ্রসন্ন মিত্র রায়পুরের উকিল
- পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষার অধ্যাপক, পরে council of Post-Graduate Teaching in Arts-এর Secretary। জন্ম ১৮৮৯-মৃত্যু ২০.৫ ১৯৬৮—৭৯ বছর বয়সে। বাড়ি টালাপার্কে। এঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় এঁর মৃত্যুর প্রায় ৪০ বছর আগে
  - পুত্র
  - পুত্র
  - পুত্র
  - কন্যা

হরিনাথ দে'র শ্বশুর বংশ

নন্দলাল বসু (কালানন্দ)
(ক'লকাতার গরাণহাটার বসু)

গ্রীক্ সওদাগরী অফিস Petrocochino-র খাজাঞ্চী ছিলেন। ১০, গকুলবড়াল স্ট্রীটে বাড়ি। হেদোর উত্তরে মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়ির মালিক কবি-সাংবাদিক ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষের বংশধর গয়াপ্রসাদ ঘোষের ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

কন্যা	পুত্র
শরৎশোভা ১৮৮৭-১৯৩৬ বিবাহ ১৮৯৫ =হরিনাথ দে	গোপাল বসু পুরীতে থাকতেন।

ভূতনাথ দে'র বংশ

৬

ভূতনাথ দে (১৮৪৫-১৯০৩)
=এলোকেশী (১৮৫৩-১৯৩৬)

হরিনাথ	ভবনাথ	দময়ন্তী	অনাদিনাথ
জন্ম ১২।৮।১৮৭৭ মৃত্যু ৩০।৮।১৯১১ বিবাহ :১৮৯৫ =শরৎশোভা ১৮৮৭-১৯৩৬	১৮৮০-১৯৪৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন। এর পুত্র কন্যারা থাকেন বোধহয় রাধাপ্রসাদ রায় লেনে।	=হুটুবিহারী ঘোষ ডিস্ট্রীক্ট ও সেশন জজ ; বালিগঞ্জে আলেয়া সিনেমার পিছনে বাড়ি	১৯০০— ১৯৬৩ রায়পুরের উকিল

ভবনাথ দে ও অনাদিনাথ দে'র পুত্রকন্যাদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারিনি। হরিনাথের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতি আভা বসু হরিনাথ দে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি কোন ভাই-এর কন্যা, কোথায় থাকেন, তার কয়টি ভাইবোন, জানি না। আর একজন বংশধরের নাম পেয়েছি—আদিত্যনাথ দে। তিনি বোধহয় ৯৩,রমাপ্রসাদ রায় লেনে থাকতেন। তিনি কি অনাদিনাথ দে'র পুত্র? ৩

এরা যদি পত্রদ্বারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে আমি হরিনাথ দে'র দুই ছোট ভাইয়ের বংশতালিকা সম্পূর্ণ করতে পারি। নইলে এই কুলপাঞ্জী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হরিনাথ দে'র বংশ

হরিনাথ দে (১২।৮।১৮৭৭—৩০।৮।১৯১১)
=শরৎশোভা (১৮৮৭—১৯৩৬)
বিবাহ ১৮৯৫

- পুত্র প্রাণধন দে (ভুলু) কলকাতা হাইকোর্টের উকিল জন্ম—১৯০৩ মৃত্যু—২।১২।১৯৩৮ ৩৫ বছর বয়সে
- কন্যা বেণু ১৯০৫-১৯১৬ ১১ বছর বয়সে মৃত্যু
- কন্যা সোনামণি জন্ম-১৯০৭ মৃত্যু-১৯০৯।১০ ২।৩ বছর বয়সে মৃত্যু
- কন্যা বিভাবতী (মুনু) জন্ম-১৯০৯-১০ মৃত্যু-জানুয়ারী, ১৯৩৮ =সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪ পরগণা ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার জন্ম-১৮৯৭ মৃত্যু-১৯৫৭
- পুত্র রাজেন্দ্রনাথ দে জন্ম-১৯২১ ৭।৮ মাস বয়সে মৃত্যু

বিভাবতী
শ্রীপ্রণব ঘোষ
জন্ম-১৯২৮
বিশ্বভারতীর জার্মান ভাষার অধ্যাপক, ৬টি ইউরোপীয় ভাষা জানেন।

বহরু ও ক'লকাতার ভঞ্জ বংশ

কৃষ্ণমোহন ভঞ্জ (বহরু গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)
মৃত্যু…১৮৩৩

কাঁথি নিমকমহলের পেশকার ছিলেন ও তেজারতি করতেন। ১৮২০ ও ১৮২২ সালে তাঁর বাড়িতে ২ বার ডাকাতি হওয়ায় সর্বস্বান্ত হন :

- ৩ কন্যা
- লোকনাথ অবিবাহিত মৃত
- কৈলাসনাথ
- দ্বারকানাথ জন্ম-৯।২।১৮২৩ মৃত্যু-২৮।৮।১৮৯৪ ৭২ বছর বয়সে =ফুলকিশোরী দক্ষিণ বারাসতের বসু বংশের কন্যা জন্ম – ১৮২৭, বিবাহ আনুমানিক ১৮৩৮, মৃত্যু-১৯২০, ৯৩ বছর বয়সে।
- হরনাথ মৃত্যু ১৪।৬।১৮৯৫
- শ্রীনাথ অবিবাহিত মৃত
- আনন্দকুমার

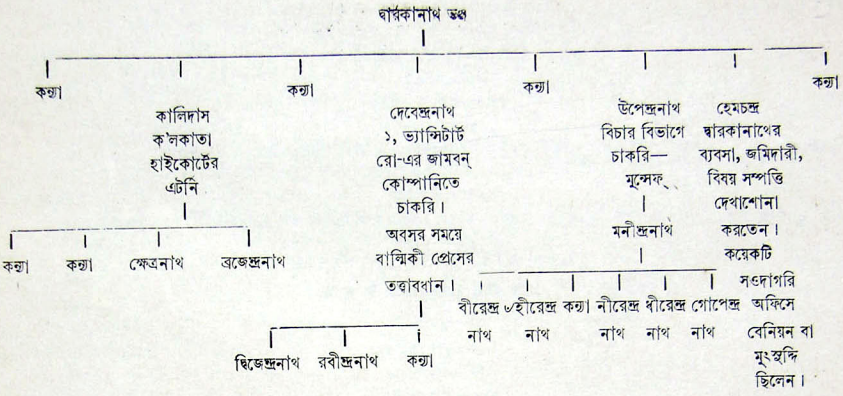
দ্বারকানাথ ভঞ্জ
কন্যা
কালিদাস
ক'লকাতা
হাইকোর্টের
এটর্নি
কন্যা
কন্যা
ক্ষেত্রনাথ
ব্রজেন্দ্রনাথ
কন্যা
দেবেন্দ্রনাথ
১, ভ্যান্সিটার্ট
রো-এর জামবন্
কোম্পানিতে
চাকরি।
অবসর সময়ে
বাল্মিকী প্রেসের
তত্ত্বাবধান।
দ্বিজেন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ
কন্যা
কন্যা
উপেন্দ্রনাথ
বিচার বিভাগে
চাকরি—
মুন্সেফ্
মনীন্দ্রনাথ
বীরেন্দ্র নাথ
৺হীরেন্দ্র নাথ
কন্যা
নীরেন্দ্র নাথ
ধীরেন্দ্র নাথ
গোপেন্দ্র নাথ
হেমচন্দ্র
দ্বারকানাথের
ব্যবসা, জমিদারী,
বিষয় সম্পত্তি
দেখাশোনা
করতেন।
কয়েকটি
সওদাগরি
অফিসে
বেনিয়ন বা
মুৎসুদ্দি
ছিলেন।
কন্যা

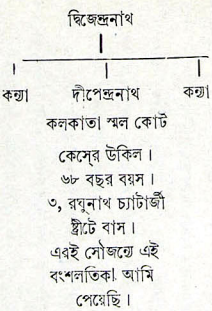
দ্বিজেন্দ্রনাথ
কন্যা
দীপেন্দ্রনাথ
কলকাতা স্মল কোর্ট
কেসের উকিল।
৬৮ বছর বয়স।
৩, রঘুনাথ চ্যাটার্জী
ষ্ট্রীটে বাস।
এরই সৌজন্যে এই
বংশলতিকা আমি
পেয়েছি।
কন্যা

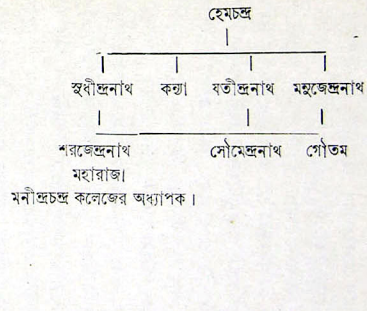
হেমচন্দ্র
সুধীন্দ্রনাথ
কন্যা
যতীন্দ্রনাথ
মনুজেন্দ্রনাথ
শরজেন্দ্রনাথ
মহারাজ।
মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক।
সৌমেন্দ্রনাথ
গৌতম

এই বংশের সৌভাগ্য ও উন্নতির মূল দ্বারকানাথ ভঞ্জ। এঁর জীবনকথা সবিস্তারে বলতে গেলে অনেক কিছু লিখতে হয়। তা এখানে সম্ভব নয়। সুতরাং অতি সংক্ষেপে তাঁর জীবনী এখানে দেওয়া হলো। ছেলেবেলায় ইনি কলকাতার রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়ে বেঙ্গল কোম্পানীর গুদাম সরকার নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সালে রবার্ট সেরিয়েল (বা চেরিয়েল, কোম্পানীর অফিসে ২ নং তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট নিবাসী শিবচন্দ্র মল্লিকের সহকারী এবং পরে ক্রমে ক্রমে বেনিয়ন নিযুক্ত হন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে ইনি কেরানীর কাজ থেকে শেষে আপিসের সর্বোচ্চ পদে উঠে প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখে যান। আশ্রিতদের প্রতি দয়া ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান তাঁর আজীবন ব্রত ছিল। তাঁর উপর লোকের এমনই বিশ্বাস ছিল যে তিনি ১২টি সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক্‌জিকিউটর ছিলেন। গরীবদের উপর তাঁর এতই দয়া ছিল যে, একশ'র উপর লোককে বাড়িতে রেখে খেতে দিয়ে তাদের জীবিকার উপায় করে দিয়েছিলেন। তিনি দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সেবার জন্য প্রায় তিরিশ হাজার টাকা দামের সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান কীর্তি বাংলা ভাষায় বাল্মীকি রামায়ণ প্রথম প্রচার করা। এঁরই সাহায্যে আদি ব্রাহ্ম সমাজে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন রামায়ণ সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেন। এজন্য দ্বারকানাথ ১৬৩০০্ টাকা দান করেন। ইনি জীবনের শেষ দশ বছর ধরে প্রায় চব্বিশটি ছেলের স্কুলের মাইনে দিয়ে এসেছেন। এরকম লোক যে হরিনাথ দে'র পিতা ভূতনাথ দে-কে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে মানুষ করবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে।

দ্বারকানাথ ১৮৫৪ সালে কলকাতার ১০, রঘুনাথ চাটুজ্যে স্ট্রীটের বাড়িটি কেনেন। তারপর ১৮৭৪ সালে ঐ স্ট্রীটের ৮নং বাড়ি ও ১৮৮১ সালে ৩নং বাড়ি কেনেন। ৮নং বাড়িটি দুর্গাদেবীর সেবায় উৎসর্গ করে গেছেন। ৩নং বাড়িতে শ্রীদীপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ থাকেন। বাকি বংশীধরেরা থাকেন ১০নং বাড়িতে। এখন ঐ বাড়ি চার ভাগ হয়েছে। তারপর দ্বারকানাথ কেনেন ১১নং, ১৩নং, ও ১৭নং ব্রজনাথ মিত্র লেনের তিনটি বাড়ি ও ৯০।৯, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাড়ি।

বিলিতি জাহাজের আমদানি ও রপ্তানি মাল খালাস ও বোঝাই করবার জন্য তিনি অনেকগুলো Cargoboat কেনেন। এছাড়া একটি দড়ি তৈরীর কল ও পাটের গাঁট বাঁধবার "হাইড্রলিক প্রেস্"ও কেনেন। ক'লকাতার সম্পত্তি ছাড়াও মফঃস্বলে অনেক জমিদারী কেনেন। শেষ বয়সে কাশীবাস করে সেখানেই মারা যান।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ

সুশীল রায়

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলার আগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা দিয়ে আরম্ভ করা যাক।

মাইকেল মধুসূদন তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—I do not know your friend Debendra Nath Tagore personally. I hear one of his sons is a good poet. He is author of a very readable translation of my favourite Meghaduta—যার বাংলা করলে দাঁড়ায় এইরকম—'আমি তোমার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনিনে। শুনেছি তাঁর একটি ছেলে নাকি ভালো কবি। আমার অতিপ্রিয় মেঘদূতের একটি সুখপাঠ্য অনুবাদ সে করেছে।' এই চিঠির তারিখ হচ্ছে ১৪ জুলাই ১৮৬০।

দেবেন্দ্রনাথের যে ছেলেটির কথা মাইকেল উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন আমাদের আজকের আলোচ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথের যে ছেলেটি কবি বলে বিশ্বে স্বীকৃত ও নন্দিত সেই পুত্রটি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তখনও জন্মগ্রহণ করেন নি, এর দশ মাস পরে (৭ মে ১৮৬১) তিনি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের যে সন্তানেরা এর পূর্বেই জন্মেছিলেন জন্ম-মৃত্যু সন সহ তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করে রাখা যায়—কন্যাসন্তান (১৮৩৮ অল্পায়ু), দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩), হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪), বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫); সৌদামিনী (১৮৪৭-১৯২০), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫), সুকুমারী (১৮৫০?-১৮৬৪), পুণ্যেন্দ্রনাথ (১৮৫১?-১৮৫৭), শরৎকুমারী (১৮৫৪-১৯২০), স্বর্ণকুমারী (১৮৫৬?-১৯৩২), বর্ণকুমারী (১৮৫৮-১৯৪৮), সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২২)। এর পরে এলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এবং সর্বশেষে বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-১৮৬৪)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অনূদিত মেঘদূত প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে, তাঁর তখন বয়স কুড়ি। ঐ বয়সে ঐ অনুবাদ কর্মটির জন্যই তিনি কবি স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে যিনি সহজে কাউকে স্বীকৃতি দেবার পাত্র ছিলেন না।

এমনকি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্তরঙ্গ ও প্রিয়জন হওয়া সত্ত্বেও রঙ্গলালের কবিশক্তি সম্বন্ধে মধুসূদন অনেক সমালোচনামূলক উক্তি করেছেন। এবং নিজের কাব্য সম্বন্ধেও রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন - Don't spare me because I am your friend. বন্ধুত্ব বন্ধুত্বই, সাহিত্যকর্মের বিচারের ক্ষেত্রে তার মধ্যে বন্ধুত্বের মেশাল দিলে সব ব্যাপারটাই ভেজাল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মেঘদূত অনুবাদের পনেরো বছর পরে বের হয় দ্বিজেন্দ্রনাথের মৌলিক কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫)। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ (১৮৮৮-১৯৬১) তাঁর 'ছেলেবেলা' শীর্ষক স্মৃতিকথায় (বসুধারা ১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ) স্বপ্নপ্রয়াণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, স্বপ্নপ্রয়াণ বেরোনোর পর, শুনতে পাওয়া যায়, মাইকেল মধুসূদন নাকি বার-লাইব্রেরীতে তাঁর বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন, if I have to doff my hat to anyone I shall do that to the poet of *Swapnaprayana*"। কিন্তু মধুসূদনের এই উক্তি স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে সম্ভব বলে মনে হয় না। গ্রন্থাকারে এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ১২৮০ শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট ১৮৭৩) সংখ্যা বঙ্গদর্শনে এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন আগেই—২৯ জুন ১৮৭৩-এ মধুসূদন লোকান্তরিত হন।

কিন্তু মধুসূদনের স্বীকৃতি সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র থেকে আমরা একটু উদ্ধৃতি দিয়ে এসেছি, স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে, মেঘদূতের অনুবাদ পাঠ করেই মধুসূদনের ওই মন্তব্য। বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে আমার 'মেঘদূত' প্রকাশিত হইল। আমি যখন মেঘদূত লিখি তখন ও-ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না; ঈশ্বর গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজীতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগ্নিপতি সারদাকে [সৌদামিনীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়] তিনি বলিলেন 'আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হতে পারে না, মেঘদূত পড়ে দেখছি সে ধারণা ভুল'।"

মধুসূদনের মত তেজস্বী কবি কখনো সহজে কারো প্রতিভা স্বীকার করেন নি। তৎকালীন অনেক কবিকে তিনি injects of an hour ব'লে অভিহিত করেছেন, সুতরাং দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাঁর এই স্বীকৃতির বিশেষ মূল্য আছে ব'লে স্বীকার করে নিতে হবে।

স্বয়ং মধুসূদন সেই সময়ে মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় নিযুক্ত। তাঁর মনে-মেজাজে তখন রাম-রাবণের বিবাদ চলেছে, কানে ধ্বনিত হয়ে চলেছে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিনাদ। সেই বিবাদের ও নিনাদের মধ্য থেকে নিজেকে একটু মুক্ত করে এনে তিনি মেঘদূতের ধ্বনিতে মোহিত হলেন—

সারা হল মনস্তাপে প্রেয়সী আমার,
বাঁচাও হে তারে মোর দিয়ে সমাচার।
যে স্থানে অলকাপুরী—থাকে যক্ষগণ
যাইতে হইবে তব সেই নিকেতন।...
দেখিবে নিশ্চয় গিয়া প্রেয়সীর স্থানে
দিবস গণনা করি বেঁচে আছে প্রাণে।
কেননা, কুসুম-সম অবলার মন—
আশা-বৃন্তে করি ভর না হয় পতন।

কাব্য সরস্বতীর উদ্দেশ্যে কুড়ি বৎসর বয়সী বালক-দ্বিজেন্দ্রনাথের এই হচ্ছে প্রথম পরিচয়পত্র পেশ। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ পরিচিত হলেন। পরিচিত হলেন তিনি কবি হিসাবে। কবি-স্বীকৃতিও লাভ করলেন তিনি।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্যও এখানে যুক্ত করা যায়, তিনি বলেছেন, (বিবিধার্থ সমূহ, আষাঢ় ১৭৮১ শক) "ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় কালিদাসের কাব্যের যে সকল অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রস্তাবিত মেঘদূত কোনোমতে কনিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে না।"

এর পরেও মেঘদূতের অনুবাদ আরো অনেকে করেছেন। সেসব অনুবাদের পাশে দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ রেখে পড়া যেতে পারে। অনুবাদ-জিনিসটা কেবল ভাষান্তর হলে তাকে অনুবাদ বলা সম্ভব নয়। তার উপর, মূল রচনার ও মূল রচয়িতার উপর অনুবাদকের আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাও যেমন দরকার, মূল ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও ততোধিক দরকার। এই দুইটি অপরিহার্য বিষয় পরিহার করে অনুবাদের কাজে হাত দিতে নেই। কিন্তু এ নিয়ম অমান্য করে মেঘদূতকে নিয়ে প্রহসন সাম্প্রতিক কালেও যে না হয়েছে এমন নয়। কিন্তু সে কথা অন্য।

যিনি জীবন আরম্ভ করলেন কবি-রূপে, তিনি তাঁর কবি-রূপ ত্যাগ না করেও উত্তর জীবনে অন্যরূপ গ্রহণ করলেন কেন, কেন এক অনন্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। মানুষের মন মানুষেরই মন। মনই মানুষকে বেহুঁশ করে, মনই মানুষকে নব-নব পন্থার হদিস দেয়। মনের চাহিদা

যার যেমন হয়, সে তেমনি তার জোগান দেবার চেষ্টা করে। কেউ পারে, কেউ পারে না। যে পারে সেই হয়ে ওঠে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতন একজন।

চার্লস ফ্রীয়ার এনড্রুজ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রায় নিত্যসঙ্গী। কোনো সমস্যায় পড়লেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ডেকে পাঠাতেন এনড্রুজকে। তাঁর স্মৃতিকথায় এনড্রুজ লিখেছেন, "বড়দাদাকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তারা কেউই প্রায় বুঝবে না কৌতুক রসবোধের কী প্রাচুর্য ছিল তাঁর মধ্যে। শেষজীবনে পর্যন্ত কোনো-কিছু যখন তাঁর কৌতুকপ্রিয় মনকে নাড়া দিত তখন তাঁর প্রচণ্ড হাসির শব্দ অনেক দূর থেকেও শোনা যেত। 'বড়দাদার হাসি' শান্তিনিকেতনে প্রায় প্রবাদবচন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

তিনি কবি, তিনি বৈয়াকরণ, তিনি দার্শনিক। এ পরিচয় তাঁর আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিচয় সম্ভবত এই যে, তিনি ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্যে-ভরা পরিপূর্ণ একজন মানুষ। সংসারজীবনে যিনি উদাসীন, আর্থিক ব্যাপারে যিনি পরাধীন। ভৃত্যকে ডেকে বলছেন, তাঁর পুত্রের কাছ থেকে একটা দোয়ানি চেয়ে আনতে কাগজ কিনবেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমি অনেক লিখিয়াছি। এই লেখাপড়া ছাড়া আর আমি জীবনে বড়-একটা কিছুই করিতে পারিলাম না। কখনো আমি বিষয়কর্ম ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।"

আমরাও বোধহয় তাঁকে ভালো ক'রে বুঝতে পারিনি। তাঁকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্যও আমাদের হয়নি—সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু আমাদের জানা সবই অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার মত। কিন্তু একথাও ঠিক স্বচক্ষে দেখেই আমরা সব বুঝিনে যারা দেখতে জানেন ও সেই দেখা অন্যকে দেখাতে জানেন তাঁদের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাঁকে ভালো-মত বুঝতে পারলে আমরা এটুকু অবশ্যই বুঝতাম যে, তাঁর মতন মানুষ অতি দুর্লভ। বিষয়কর্মে নিপুণ এবং সংসার ব্যাপারে সচেতন মানুষ আমরা অনেক দেখেছি। অনেক দেখেছি, কেননা এঁদের সংখ্যাও অনেক। পৃথিবীতে এঁদের অভাব কখনো হয়তো হবে না। কিন্তু যে অভাবে আমরা ভুগছি তা এই—এইরকম মানুষের অনটন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলেন, এমন কথা আমরা বলছি না। অর্থের প্রতি আসক্তি তাঁর ছিল না। তিনি ওসব দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর পুত্রকে। নিজে থাকতেন রিক্তহস্ত হয়ে। কাগজ কেনার দরকার হলে একটা দোয়ানির জন্যে দরবার করতে হ'ত তাই পুত্রের কাছেই। এবং তা ভৃত্য মারফত।

মনকে পূর্ণ করে রাখতে পারে এমন বিষয় যাদের না-থাকে, মনকে আকর্ষণ

করতে পারে এমন বস্তু যাদের না-থাকে তারাই মনকে ভরাট করে অন্য ব্যাপার দিয়ে, বেশিরভাগই অর্থকরী ব্যাপার দিয়ে। প্রকৃতি নাকি কোনো জায়গায় ফাঁক রাখতে চান না। সেইজন্যেই মন যখন শূন্য হয়ে থাকে তখন অর্থ তা পূর্ণ করে দেয়। অনেকেরই মনে হল—মিটে গেল সমস্যা, অর্থপূর্ণ হয়ে গেল সব।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের মন পূর্ণই ছিল। গীতা পাঠে, বাংলা শর্টহ্যাণ্ডে, স্বরলিপি প্রবর্তনে, নানা চিন্তায়, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায়, জিওমেট্রিতে, বক্সোমেট্রিতে। সংসারে তাঁর মন তাই প্রবেশ করল না, বিষয় চিন্তায় বিভোর হওয়ার অবকাশ তিনি পেলেন না।

তাঁর এত আকুলতা ব্যাকুলতা ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ এসবই তিনি তাঁর নিজস্ব অনুরাগ ও প্রবৃত্তির দ্বারা লাভ করেছিলেন। কেননা, স্কুল-কলেজের সঙ্গে পরিচয় ছিল খুব কম। তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। লেখাপড়া করতেন বাড়িতেই। কিছুকাল বাংলা প'ড়ে একেবারে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ আরম্ভ করে দেন। বাড়িতে পণ্ডিতমশায়ের কাছে পড়তেন। ক্রমে মুগ্ধবোধ পার হয়ে রঘুবংশ কুমারসম্ভব শেষ করেন। অঙ্ক তাঁর ভালো লাগত, ভালো লাগত টিগনোমেট্রি।

তিনি আরও বলেছেন, "আগে বরাবর আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। ছবি আঁকার দিকে আকৃষ্ট—বড় হইয়া painter হইব।"

ছবি তিনি এঁকেছেন। বেশির ভাগই রেখাচিত্র। অনেক চিঠির শেষে ইতির পরে একটি মুখ এঁকে নিজের পরিচয় দিতেন, এরকম কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকায়।

বাংলা কবিতা তিনি লিখেছেন অনেক। স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থে তা গ্রথিত। কিন্তু তাঁর কাব্যচর্চা কিংবা চিত্রকলাচর্চা বেশিদিন চলে না। তাঁর মন অন্যত্র ধাবিত হয়। তিনি যখন স্বপ্নপ্রয়াণ রচনায় লিপ্ত তখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় বিভোর। ১৮৬৬ থেকে ১৮৬৯ এই চার বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর তত্ত্ববিদ্যার চারটি খণ্ড। স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হতে থাকে বঙ্গদর্শনে ১৮৭৩-এ।

আচার্য কৃষ্ণকমল তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেন 'আমার যথার্থ কবিতার mood যখন ছিল—অর্থাৎ সেই বাল্যকালে আমি এ কাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই। সে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মশগুল ছিলাম তার জন্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে'।

এ সত্ত্বেও এই রূপক কাব্যটি বাংলাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

আমাদের এই কালে এ ধরনের চরিত্র বিরল হয়ে আসছে। এঁরা সব হয়ে গেছেন ইতিহাসের অধিবাসী, আমাদের প্রতিবেশীরূপে এমন মানুষ আমরা বুঝি আর পাব না। এই কালটা হয়ে গেছে specialist-এর কাল, speciality-র যুগ। এখন অমুকেই বেশি মর্যাদা পান যিনি নিজের পরিচয় দিতে পারেন specialist in right eye বলে, অর্থাৎ দক্ষিণ চক্ষুতেই তাঁর দাক্ষিণ্য, বাম চক্ষুর প্রতি যিনি বাম।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ জাতীয় ব্যক্তিরা এরকম বিশেষভাবে অজ্ঞ ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, নানা ব্যাপারে অভিজ্ঞ। তাঁরা তাই আমাদের নমস্য।

রবীন্দ্রনাথের এই বড়দাদা তাই সকলের বড়দাদা হয়ে গিয়েছেন। সকলের সম্মান মর্যাদা শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছেন, এবং পাচ্ছেন। নিজে তিনি উদাসীন প্রকৃতির ছিলেন বলেই তাঁর সম্বন্ধে আমরা কেউই উদাসীন হতে পারছিনে। শ্রদ্ধা যিনি পান তিনি শ্রেয়, যাঁরা শ্রেয় ব্যক্তিকে পান এবং শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ পান তাঁরা ভাগ্যবান্।

এই বড়দাদা সম্বন্ধে চার্লস এনড্রুজ লিখেছেন জাহাজে বসে, তিনি লিখেছেন, "এমনি করে সমুদ্রে ভেসে চলেছি আর বড়দাদার কথা লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব স্মরণ করছি—আমার খুব ভালো লাগছে। যে অলৌকিক দৃশ্য দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম, ক্রমে আশা হচ্ছে পাঠকদের কাছেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।...আগে এরকম যাবার সময় যখন সমুদ্র পীড়ার প্রকোপে দিন আমার কাটতে চাইত না, ... তখন শান্তিনিকেতনে 'নিচু বাংলা'য় আরাম-কেদারায় শয়ান বড়দাদার কথা মনে পড়ত। আমি সুস্থবোধ করতাম, স্বস্তি পেতাম।"

বড়দাদা নামে সম্বোধিত এই লোকটির 'অলৌকিক' প্রভাব অবশ্যই ছিল। তা না হলে তাঁর কথা মনে পড়ায় পীড়িত ব্যক্তির অসুস্থতার উপশম হবে কেন।

যাঁরা বড়দাদাকে কখনও দেখেননি, মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন তাঁদের কাছে সেই ছবি স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন এনড্রুজ। শিশুর মত স্বভাব ছিল বড়দাদার। ভগবানের রাজত্বে শিশুর মতই নাকি প্রবেশ করতে হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি সকলের যে আকর্ষণ ছিল তা তাঁর এই শিশুসুলভ

সরলতার জন্যেই। কাঠবেড়ালী ও নানারকমের পাখি দ্বিজেন্দ্রনাথের গায়ে-মাথায় নাকি বসত। তাদের কোনো ভয়ভীতি ছিল না। এর কারণও ওই। ঐ সব জীব তাদের ইন্‌স্‌টিংকট দিয়েই বুঝত যে, জায়গাটা নিরাপদ। শিশুর কাছে যেতে যেমন তাদের কোনো ভীতি নেই, এখানেও তারা তেমনি নির্ভীক ভাবেই চলাফেরা করতে পারত। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যে অনেকই বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু ঐসব জীবেরা তাঁর সঙ্গে ঐ সহজ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে তাঁর চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। তাঁকে অনায়াস অনাড়ম্বর এক তপস্বীরূপেই চিত্রিত করে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন painter (চিত্রকর) হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঐ জীবেরা তাঁর চরিত্রের এক অনঙ্কিত চিত্র মেলে ধরেছে আমাদের সম্মুখে। তারাই হয়ে উঠেছে যেন চিত্রকর।

কিন্তু পূর্ণ চিত্র তারা তৈরী করতে পারেনি। দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে আরও অনেক বিচিত্র রং ও রেখা আছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁর বন্ধু। তাঁরাও ছিলেন দেশভক্ত। তবু, তাঁদের সেই দেশ-প্রীতি দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে খুব খাঁটি বলে মনে হয়নি। তাই তিনি বলেছেন, "রঙ্গলালই বল আর রাজনারায়ণই বল তাঁদের patriotism বারো-আনা বিলাতি, চার-আনা দেশী। ইংরেজ যেমন patriot আমিও সেইরকম patriot হব—এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন—আমি আমার মত patriot হইতে না-পারিলে কি হইল।"

স্বদেশপ্রেমোদ্যোতক সংগীত-রচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথেরও দান আছে, সে কথা আমরা অবশ্যই ভুলিনি, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে সেই গানটি যা রচনা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'।

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন ঘটনাহুল নয়। এ কথা যেমন সত্য তেমনি একথাও সত্য যে তাঁর জীবন কর্মময়। সারাজীবন তিনি বাগ্‌দেবীর আরাধনাতেই কাটিয়েছেন—ঐ ব্যাপারই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান ও উপাসনা।

তিনি যেমন লিখেছেন অনেক, তেমনি কাজও করেছেন অনেক রকমের। তিনি রচনা করেছেন ব্রহ্মসংগীত। আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন তার স্বর-সুর-লয়-তান ধরে রাখার জন্যে উদ্‌ভাবনকরেন এক পদ্ধতি। তিনি বলেছেন, "বাঙ্গালায় প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত তাহা

একেবারে নিঃসন্দেহ। শৌরীন্দ্রমোহন তাহার পরে তাড়াতাড়ি একটা স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া দিল।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন ২৫ বছর। এই পত্রিকার ১৭৯১ শক কার্তিক (১৮৬৯ অক্টোবর) সংখ্যায় 'সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী' ও পাঁচটি ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি ছাপা হয়—কিন্তু তাতে কোনো নাম ছিল না। কিন্তু এগুলি যে দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত সে সম্পর্কে প্রতিভাসুন্দরী দেবী 'বালক' পত্রিকার ১২৯২ বৈশাখ (১৮৮৫ এপ্রিল) সংখ্যায় 'সহজে গানশিক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, 'এখানে গীত লিখিবার যেরূপ সংকেত বলিয়া দেওয়া হইল তাহা ১৭৯১ শকের কার্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল।" 'বালক'এর ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'নূতন স্বরলিপি' শীর্ষক রচনাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'ভারতী' পত্রিকার নামকরণ তাঁর। তিনিই এর প্রথম সম্পাদক। 'হিতবাদী' পত্রিকার নামকরণও তাঁরই। এই সব নামের ভিতর দিয়েও তাঁর মনের ভাব স্ফুট হয়ে ওঠে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যপ্রাণের ও কবিমনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বহুবিধ সংস্কারের কথাও তিনি ভেবেছেন। আমরা ইদানীং দ্বিত্ব বর্জনে উদ্যোগী হয়েছি, আমরা এখন আর্ত্ত না লিখে লিখি আর্ত, গর্দ্দভ, গর্ব্ব ইত্যাদিও এখন গর্দভে ও গর্বে পরিণত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ কতকাল আগে এই সংস্কারের ও বাহুল্যবর্জনের প্রস্তাব করেন—

বর্ণমালি! রাণী-মা কী বলিছেন শোনো।
"তেলা শিরে তেল দিয়া ফল নাই কোনো॥
"আর ত দিলে আর্ত-এ, ছাড়িবে আর্ত্তরব।
"আর দ চাপাইলে পিঠে মরিবে গর্দভ॥
"কর্ম্মের ম-এ ম-ফলা অকর্মের শেষ।
"কার্য্যের য-ফলা অকার্য-বিশেষ॥
"অর্জ্জনের দেহ ফুলি হইয়াছে ঢাক।
"কাজ নাই তাহাতে, অর্জন বেঁচে থাক্॥
"গর্ব্ব গর্ত্ত অতিশয় গর্ব্ব গর্ত্ত এটা।
"গর্ব গর্ভ লিখিলেই চুকি যায় লেঠা॥

"কর্কশ-নিনাদে একে কান ঝালাপালা।
"দ্বিগুণ কর্ক্কশ করি বাড়ায়োনা জ্বালা॥

এসব তিনি কৌতুকের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করেছেন, আমরা তা অবশ্যই বানান-ব্যাপারে তাঁর যৌতুক রূপেই গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে সম্ভবত আমরা ভুলে গিয়েছি।

তাঁর কৌতুকরস ছিল অসাধারণ। এই প্রকারের অনেক ছড়ার ছড়াছড়ি আছে তাঁর রচনায়। টাকার মায়া তাঁর ছিল না, কিন্তু টঙ্কাদেবীকে স্মরণ করেছেন এইভাবে

ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ-গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লী মন উড়ু-উড়ু এ কী দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী করে যদি কৃপা না-রহে কোনো জ্বালা
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না, খালি ভস্মে ঘী ঢালা।

সকলের মনের কথা তিনি এমনি সহজে সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন তাঁর মনের সারল্যের গুণেই। 'ভ্রমণ-গমনে'র স্থলে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রে পাওয়া যায় 'তব দরশনে', অন্যত্র আবার 'জগ-দরশনে'। কোন্‌টা আদি পাঠ তা নির্ণয় করা শক্ত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বড়দাদার চেয়ে একুশ বছরের ছোট। সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার পঁয়ষট্টি বছর পূর্তি উপলক্ষে লিখলেন:

সেদিনের সে বালক রবি পঞ্চষষ্টি হইল পার
চমৎকার না চমৎকার।

এই সহৃদয় কৌতুকপ্রবণতার মাঝেও চলেছে তাঁর নীরস কাজ। তিনি, রচনা করছেন রেখাক্ষর বর্ণমালা, অর্থাৎ বাংলা শর্টহ্যাণ্ড, সে সম্বন্ধে কয়েকটি ছত্র—

বাঙ্গালা বর্ণমালায় উপসর্গ নানা
অদ্‌ভুত নূতন সব কাণ্ডকারখানা।
য-এ শূন্য ড-এ শূন্য, শূন্য পালে পাল
দেবনাগরিতে নাই এসব জঞ্জাল।

এ ছাড়া ছিল তাঁর নানা শখ। তিনি 'কাগজের বাক্স রচনা প্রণালী' উদ্ভাবন করেন, তার নাম হয় Boxometry। তা ছাড়া ছিল Ontology (তত্ত্ববিদ্যা), ছিল Geometry in which the 12th axiom has been replaced by

new ones —এসব সম্বন্ধে তিনি তৎকালীন পত্রিকায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন।

তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা সামান্য নয়। তার মধ্যের কয়েকটি এই—

মেঘদূত (১৮৬০), ভ্রাতৃভাব (১৮৬৩), তত্ত্ববিদ্যা ৪ খণ্ড (১৮৬৬, ১৮৬৭, ১৮৬৮, ১৮৬৯), স্বপ্নপ্রয়াণ (১৮৭৫), সোনার কাটি রূপার কাটি (১৮৮৫), সোনায় সোহাগা (১৮৮৫), আর্যামি ও সাহেবিআনা,…

রেখাক্ষর-বর্ণমালা, বাংলা শর্টহ্যাণ্ড পুস্তক। এর প্রাথমিক খসড়া ১২৯২ 'বালক' পত্রিকায়, সচিত্র আকারে ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫ ও আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৬ 'পূর্ণ' ও ১৩১৩-১৫ সালের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মুদ্রিত।

গীতাপাঠ (১৯১৫), নানাচিন্তা (১৯২০), প্রবন্ধমালা (১৯২০), কাব্যমালা (১৯২০) চিন্তামণি (১৯২২)।

ইংরেজি ॥ Geometry in which the 12th axiom has been replaced by new ones, Ontology (তত্ত্ববিদ্যা), Boxometry প্রভৃতি।

এ তো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর কিছু রচনা। তাঁর অনেক লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তার সংখ্যাও সামান্য নয়। বর্তমান নিবন্ধকার যখন বিশ্বভারতীর কর্মী ছিলেন তখন ঐসব রচনার একটি তালিকা প্রস্তুত করান। তালিকাটি দীর্ঘ। বিষয়-অনুসারে সাজিয়ে কয়েক খণ্ডে গ্রন্থপ্রকাশের ইচ্ছায় এই কাজ করা হয়। কিন্তু সব কাজ সকলকে দিয়ে হবার নয়। তালিকাটির বঙ্গাক্ষরে টাইপ করানো কয়েকটি কপি বিশ্বভারতীতেই আছে। যদি কেউ উদ্যোগ করে কাজটা করেন তাহলে অনেকেই খুশি হবেন।

এই নিবন্ধ রচনায় এই সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী, চার্লস ফ্রীয়ার এনড্রুজের বড়দাদা (প্রণতি মুখোপাধ্যায় অনূদিত), নগেন্দ্রনাথ সোমের মধুস্মৃতি, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক রচিত মালা, কৃত্তিবাস (কার্তিক ১৩৮২) পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা, ধ্রুবপদী পত্রিকা আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৮৭) প্রভৃতি।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ ও তার প্রতিকার

সুপ্রিয়কুমার ভট্টাচার্য

বিগত এক যুগ ধরে সমস্ত দেশে ছাত্রসমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত বহু লোকের মনে শিক্ষায় অব্যবস্থা ও অরাজকতা নিয়ে একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। এই অসন্তোষ আজ একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং শিক্ষাজগতে সংকট সৃষ্টি করেছে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রায়ই ধর্মঘট হচ্ছে, ছাত্রদের একটি অংশ এবং বাইরের কিছু লোক পরীক্ষা কেন্দ্রে বাহুবলের আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষাগ্রহণে বাধা দিচ্ছে বা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। শিক্ষক সমাজ, বাস্তব জীবনের রূঢ়তায় ও সংঘাতে নিরাশ হয়ে পড়েছেন এবং বেশ কিছু অংশ আদর্শচ্যুত হয়ে প্রাথমিক চাহিদা পূরণের দাবিতে বিদ্যালয় ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন।

অপরদিকে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আর একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই বেকার সমাজের বৃহৎ অংশটি আবার বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত। এই হতভাগ্য দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে কলকারখানা ও উন্নত কৃষিভিত্তিক পরিকল্পনার প্রসার না ঘটায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে ছাত্র সমাজের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই শিক্ষার উপকারিতা বা কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ এনে দিয়েছে। তাই আজকের ছাত্র সমাজ এবং তাদের সাথে তাদের অভিভাবকরাও হতাশায় ভারাক্রান্ত। এই হতাশার প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন সমালোচনা থেকে এবং এর বিচার চলছে নানান্ দৃষ্টিকোণ থেকে।

কিছু চাইছেন পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন, কিছু চাইছেন শিক্ষা সময়ের পরিবর্তন, কেউ কেউ পাঠ্যসূচীর সংস্কার দাবি করছেন এবং অনেকে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতির প্রায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন দাবি করছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কি সত্যই এত নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছে যে উপরোক্ত সব পরিবর্তনই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে? যাঁরা এই সমস্ত পরিবর্তন দাবি করছেন তাঁরা দাবিটাই রাখছেন কিন্তু কেন এই সব পরিবর্তন

প্রয়োজন এবং আদৌ প্রয়োজন কিনা তা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন না। যদি বা মেনেই নেওয়া যায় যে এই সকল পরিবর্তন প্রয়োজন, তাহলে ভাবতে হয় সেই পরিবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির রূপ কেমন হবে এবং ফলই বা কি ফলবে? লেখক এইরকম কিছু বর্তমান প্রশ্ন সামগ্রিকভাবে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে সমস্যা সমাধানের কিছু উপায় উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

ক্রমবর্ধমান নাগরিক সভ্যতার বিস্তৃতি ও বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন যদি দরকার হয়ে থাকে তবে তা করতে হবে সময় ও জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কিন্তু এই পরিবর্তন কত ব্যাপক? কোন্ স্তরে? এবং কেন হবে তার আলোচনাই করা যাক্। শুধুমাত্র সমালোচনার খাতিরে বলছি না যে স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবই ঠিক আছে, যা কিছু খারাপ তা হচ্ছে শ্রেণীঘর, ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দ, আরো খারাপ হচ্ছে বইগুলো এবং সর্বোপরি শিক্ষাপদ্ধতি। এই বলে ত আমরা খালাস পেয়ে যাব না বরঞ্চ এই বোঝার উপর আরও পাথর চাপবে যদি না এর একটা পথ এখনই খুঁজে বের করা না হয়। জ্ঞানার্জনের জন্যই হোক বা রুটি রোজগারের জন্যই হোক, শিক্ষা তখনই অর্থপূর্ণ হবে, যখন একে অপরের পরিপূরক হবে। কাজেই দুয়েরই দরকার - একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি চলতে পারে না, বিশেষ করে আজকের জগতে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত শিক্ষার মান থেকে—আমাদের শিক্ষার মান নীচু হতে দেওয়া চলবে না, বিশেষ করে যখন আজকের দিনে জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে বিশেষ-বিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী করবে। এই বিশেষ-বিদ্যা (Specialized Knowledge) এতই গুরুত্বপূর্ণ ও বিদেশে এর অনুশীলন এবং প্রয়োগ এত ব্যাপক যে এই সকল বিদ্যার্জনে উৎসুক ছাত্রকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার সমপর্যায়ে পৌঁছুতে হবে। তবেই সে পাল্লা দিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে বিশ্ব সমাজে, চিন্তাশীল সমাজে। উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ-বিদ্যার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় উপাদান হল মৌলিক শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তি এবং মূলসূত্রের (Fundamentals) উপর প্রচণ্ড দখল। এই দুটি উপাদানের গুরুত্ব আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। যদি চেষ্টা করে এই দুটিকে অর্থবহ করাও যায় তবুও এই দুটির কোন মূল্যই থাকবে না যদি না আমরা নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন মানুষ তৈরী করতে না পারি। এইগুলি শুধুমাত্র পরীক্ষা পদ্ধতি বা পাঠ্যসূচীর বদল করেই আয়ত্তে আনা যাবে না। এর জন্য দরকার সরকারের এবং সমাজের একযোগে একমত হয়ে

প্রশাসনিক সংস্কার করা ও কার্যপদ্ধতি স্থির করা এবং এর শুরু করতে হবে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে—বিদ্যারম্ভ হতে। শিক্ষাকে গ্রহণ ও ধারণ করার উপযুক্ত ভিত্তি তৈরী করতে হবে কিণ্ডারগার্টেনে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে এবং পরিবার ও সমাজকে এর অংশীদার হতে হবে সর্বতোভাবে।

আজকের সমাজের একটি বিশাল অংশ যন্ত্রশিল্পের উপর নির্ভরশীল। হয়ত পনর বছর আগেও এরা ছিল পুরানো কৃষিভিত্তিক সমাজের অংশ। এই পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটেছে এবং ঘটবে যে এদের অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব হবে না এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার। কাজেই এই বিশাল পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়তে না পারলে, সভ্যতা আমাদের যা কিছু মানবিকতা, ভদ্রতা ও সৌন্দর্য দিতে চায় বা শেখাতে চায়, আমাদের সমাজ ঠিক তার উল্টো অপগুণকে সম্বল করে গড়ে উঠবে। এটি ঘটেছে এবং আরও ঘটবে কারণ সমাজের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর একটি সময়োচিত যথাযথ শিক্ষার কোন বন্দোবস্তই করা হয়নি। এরা জোয়ারের টানে ভেসে এসেছে অন্য একটি অবস্থায়—যার সঙ্গে আগেকার সমাজের কোনও মিলই নেই—তারা পেয়েছে কাঁচা পয়সা—যা ছিল দুর্লভ তাদের কাছে, তারা শুনেছে দাবির কথা কিন্তু কর্তব্যের কথা নয়, তারা পেয়েছে সম্পদের মোহ—ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছে। এই পথ হারানোর ফল ভোগ করছে তাদের বংশধররা—যারা গড়ে উঠছে অমানুষিক পরিবেশে। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হয়ত অনেক আছে কিন্তু লেখকের বর্তমান বিশ্লেষণ তার দৃষ্টিকোণ থেকে, আর সেই দৃষ্টিকোণ হচ্ছে প্রাথমিক ও নৈতিক শিক্ষার সুপরিকল্পিত প্রসার।

এই প্রবন্ধটাকে মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগটি শিশুশিক্ষা ও তার গুরুত্বের উপর নিয়োজিত হয়েছে। এই ভাগটির গুরুত্ব এত বেশী যে এটিকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহু জায়গাতেই উল্লেখ করতে হয়েছে। এই ভাগটির গুরুত্বের মূল কারণ এই যে যদি এই স্তরেই শিক্ষা অবহেলিত হয়, নীতিবোধ না জন্মায়, তবে এর সংশোধন পরবর্তী শিক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর করা যায় না।

প্রথম ভাগটির তিনটি দিক আছে—এই তিনটি দিকের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে এর যে কোন একটিকে বাদ দেওয়ার অর্থ হবে একটি তেপায়া টেবিলের যে কোন একটি পায়াকে বাদ দেওয়ার মত। এই তিনটি দিক হচ্ছে স্কুল প্রশাসন ও পরিচালন পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ও পঠন পদ্ধতি, পরীক্ষা

পরিচালন এবং সর্বোপরি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি। অবিদ্যার আশ্রয়ে যেমন বিদ্যালাভ হয় না, তেমনি অশ্রদ্ধায়ও জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। উপরিল্লিখিত তিনটি দিকের যথোপযুক্ত গঠনই বিদ্যার্জনের পরিবেশ ও শ্রদ্ধার আশ্রয় তৈরী করতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে বয়স ও পাঠ্যপুস্তকের কি সম্বন্ধ তা নিয়ে আলোচনা।

তৃতীয় ভাগটি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম ও পরীক্ষা কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার আলোচনা।

যেখানে ছাত্রসংখ্যার চাপ অত্যধিক, ভৌগোলিক দূরত্বের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব, সেই সব ক্ষেত্রে উন্নততর প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার জন্য এইগুলির বিকেন্দ্রীকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। এর সঙ্গে দরকার হবে আরও স্কুলের।

সর্বোপরি কিণ্ডারগার্টেন বা প্রাথমিক শিক্ষার পর একটি প্রিপারেটরী স্তরের কথা বলা হয়েছে। তেমনি উচ্চ মাধ্যমিক বা স্কুল ফাইনালের আগেও একটি প্রিপারেটরী স্তরের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য এবং ছাত্রদের মন বিকাশের সহায়ক হবে বলেই এই ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষা কি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যই বা কি এই দুটি প্রশ্নকে সংজ্ঞাধীন করে এবং সর্বদা মনে রেখে যদি এই প্রবন্ধটি আলোচনা করা যায়, তবেই এর সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক প্রশ্নগুলির কিছু কিছু যুক্তিযুক্ত সমাধান পাওয়া সম্ভব হবে।

এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে এইসব কিছু করে শিক্ষাকে হয়ত বাঁচিয়ে তোলা যাবে কিন্তু এ সব কিছুই বিফল হয়ে যাবে যদি সমগ্র দেশে কৃষি ও শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না হয়। কারণ শিক্ষাশেষে যাঁরা বেরিয়ে আসবেন—তাঁরা নিজেরাই করুন বা কোথাও জীবিকার জন্য যান—যাবেন কোথায়?

শিক্ষা কি?

শিক্ষা হল যে কোন বিষয় বা বস্তুকে পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি, ও তার বিশ্লেষণ করে এটিকে যুক্তিপূর্ণ করে লিখিত বা মৌখিক ভাবে প্রকাশ করার সমন্বয়। এই সমন্বয়ের

মাধ্যমে এমন একটি শৃংখলা ও স্বভাব গড়ে ওঠে, যা কিনা আমরা যে সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করছি তাকে গ্রহণ এবং উন্নত করার উপযুক্ত। এই সম্মিলিত ক্ষমতা বা শিক্ষা তা বিদ্যালয় বা পরিবেশ যেখান থেকেই ছাত্র অর্জন করুক না কেন, এটি সময়ের সমান তালে পরিবর্তনশীল হতে হবে। তাহলেই শিক্ষা সৃষ্টিকারী হবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত মন স্বাভাবিকভাবেই স্বকীয় চিন্তা, ধারণা ও বিশ্বাস দ্বারা সমাজের মহত্তর উদ্দেশ্য রূপায়ণে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ শুধু আত্মতৃপ্তিই পায় না বা আত্মোন্নতিই ঘটায় না, সে এই আত্মতৃপ্তি ও আত্মোন্নতি ব্যক্তিগত তথা সামাজিক উন্নতিতে নিয়োগ করে। সুতরাং এই দুটি প্রকৃতি নির্দেশক ধর্ম সমাজ বা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা সঙ্গতিহীন হয় না। শিক্ষা যখন আনন্দ সৃষ্টির জন্য পরিচালিত হয় তখন সেই শিক্ষা থেকে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই উপকৃত হয় এবং সমাজ উন্নততর হয়, ব্যক্তি তথা সমাজের তৃপ্তি, আনন্দ ও উন্নতি সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কখন নিয়মানুযায়ী শিক্ষা শুরু হবে?

সাধারণ নিয়মানুযায়ী অবশ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা শৈশবই শুরু হওয়া উচিত। এর কারণ, জীবনের শুরুতে শিশুর শিক্ষা গ্রহণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী থাকে এবং শিশুকে ভবিষ্যৎ উন্নতির যোগ্য সমাজবোধের রীতিতে গড়তে পারা সহজসাধ্য হয়। এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষার গলদটা তাহলে কোথায় যখন কিনা কিছু সংখ্যক ভারতীয় শিশুকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের কিণ্ডারগার্টেন অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষাদানের চেষ্টা করছেন। প্রত্যক্ষভাবে গলদ এই সমস্ত স্কুলের পরিচালন এবং পঠন পদ্ধতি ব্যবস্থায় এবং পরোক্ষভাবে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত কিছু বিদ্যালয়ে মুষ্টিমেয় উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাই মাস মাইনে দিয়ে পড়তে পারে। তদুপরি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিশুশিক্ষার মান হয়ত কিছু আছে অথবা রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ছাত্রসমাজের অবশিষ্ট অংশ, যা কিনা মোট ছাত্রসমাজের শতকরা ৮৫ ভাগ, তারা এই শিক্ষার সুযোগ থেকে বাধ্য হয়েই বঞ্চিত এবং এর ফলে এদের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

এবং জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। এ বহুদিন থেকেই ঘটছে এবং যদি প্রতিকার না হয় তবে আরও অধিক হারে ঘটতে থাকবে। এই শিশুরা সমাজের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গড়ে উঠছে এবং গড়ে উঠবে তা থেকে সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হচ্ছে এবং হবে।

অর্থনৈতিক কারণে এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রত্যক্ষ ফল অত্যন্ত গুরুতর। শিশুশিক্ষার যথাযথ পরিকল্পনার দ্বারা এই শ্রেণীভাগ এবং বৈষম্য দূরীভূত হলেই এই অকাম্য পরিস্থিতি অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে। এই দেশে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার মত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কাজেই এই প্রাথমিক পর্যায়ে হয়ত সরকারের পক্ষে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা খুবই ব্যয়বহুল হবে। লেখকের হিসাব মতে এই পর্যায়ে প্রতিবছরে খরচ হবে প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা। হয়ত আরও প্রাথমিক স্কুল খোলারও দরকার হবে।

যদি দেশের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়, দেশের চরিত্র গঠন করতে হয়, দেশকে স্বাস্থ্যে ভরপুর করতে হয়, তবে এই খরচ অবশ্য কর্তব্য বলে ধরে নিয়েই করতে হবে—এর বিকল্প ব্যবস্থা নেই - এমনকি পরিবার নিয়ন্ত্রণেও তা সম্ভব হবে না। চারাগাছ যেমন জল চায়, আলো চায়, বাতাস চায়, সার চায়, তেমনি কোমল শিশুরা সবাই যদি সুশিক্ষার সমস্ত সাহায্য যথাসময়ে পায় তবে আজ থেকে ১৫ বৎসরের ভিতর সমস্ত দেশ তাদের সুস্থ জীবন ও মানসিক উন্নতির সকল সুফল উপভোগ করবে। যাদের জীবন চলে গিয়েছে এবং যাদের জন্য সমাজ আজ বিড়ম্বিত তাদের ফেরানোর কোন উপায় হয়ত আজ নেই কিন্তু যারা এসে গেছে এবং আসছে তাদের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরিকল্পনা অবিলম্বে দরকার। এই পরিকল্পনায় দুই রকমের ব্যবস্থা থাকবে—এক কৃষিভিত্তিক সমাজের উপযোগী শিক্ষা—আর একটি নাগরিক সমাজের উপযোগী শিক্ষা। অবশ্য এই দুয়ের যোগসূত্রের জন্য প্রাথমিক স্তরে একটি সাধারণ পাঠ্যসূচী থাকবে।

পাঠ্যক্রম

হাতে গোনা যায় এমন যে কটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল আছে সেগুলির শিক্ষার্থী শিশুদের প্রায়ই শোনা যায় "Mary had a little lamb" বা "Baa Baa Black sheep" ইত্যাদি ছড়া আবৃত্তি করতে। গ্রেট ব্রিটেনের শিশুরা ঐতিহ্যানুযায়ী এই সকল ছড়ায় অভ্যস্ত, কিন্তু কি করে এর থেকে ভারতীয় শিশুরা উপকৃত হবে? আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ভাল ছড়া অনেক আছে। এইগুলি থেকে

বেছে বেছে ছড়াগুলি ভারতীয় শিশুদের দেওয়া হোক। এতে বিভিন্ন সমাজ ও প্রদেশের যোগবন্ধনের সেতু রচনা করা সহজ হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে ইংরাজী ছড়া শোনানো হবে না। ইংরাজী ছড়ার স্বাদও শিশুদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে উপকারই হবে। কারণ এই সব ছড়ার মাধ্যমে শিশুমনের প্রসার ঘটবে এবং পরিচয় ঘটবে বিশাল বিশ্বের সঙ্গে। তবে দেশীয় ঐতিহ্যের তৈরী ভিত্তির উপরই এই বাড়তি সুযোগ দিলে উপকার হবে।

এই সব ছড়ার সঙ্গে বর্ণপরিচয়, প্রাথমিক পর্যায়ের অঙ্ক (সংখ্যা চেনা, জোড় বিজোড় সংখ্যার পরিচয়, ছোট্ট যোগ বিয়োগের expreiment) প্রাথমিক স্তরের ভূগোল এবং নীতিবোধ ঘটে এবং ইতিহাসের শিক্ষা হয় এমন সমস্ত সুন্দর অথচ ছোট্ট গল্প হবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পর্যবেক্ষণের দ্বারা (খেলার মাধ্যমে) বাস্তব শিক্ষা, যেমন কিনা, পাতা ও ফুল দেখে গাছ চেনা, আকৃতি ও পাতা থেকে ফল সম্বন্ধে ধারণা, রঙের এবং গঠন বিন্যাসের দ্বারা ফুল, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ্য বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি শেখাতে হবে। এই সমস্ত জোগাড় করে Laboratoryর মত করে রাখতে হবে—কিন্তু Laboratoryর বৈশিষ্ট্য হবে খেলাঘরের মত। এই Laboratory-তে থাকবে পাট, ধান, চা ইত্যাদিরও নমুনা।

ভূগোলে থাকবে নদীর নাম, বিশেষ বিশেষ জায়গার নাম, দিক্‌নির্ণয় খেলা, দেশের জন্তু-জানোয়ার, পাখী, মাছ ইত্যাদি নানা বিষয় যা শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। এই সমস্ত জিনিসগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বাস্তব পন্থায় শিক্ষার পদ্ধতি বের করতে হবে। শিশুরা এইগুলি নিজেদের চিন্তার মাধ্যমে কথায় বা লিখে প্রকাশ করবে। এই প্রকাশের বিকাশের জন্য বাক্য গঠনের মূল এবং লেখার পদ্ধতিও একটু একটু করে শেখাতে হবে। এইভাবে ছাত্র যখন বড় হতে থাকবে ও সকল বিষয়ের মূলটিকে ভাল করে বুঝতে শিখবে—তখন সহজ পাঠ্যক্রম থেকে ক্রমশঃ জটিল বিশ্লেষণমূলক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করতে হবে।

কিণ্ডারগার্টেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বইয়ের সংখ্যা কম রাখতে হবে। বইগুলির ছাপা ত্রুটীমুক্ত হবে এবং বাচ্চাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মত মজাদার করে বড় বড় অক্ষরে ছাপতে হবে। বইগুলির মধ্যেই লেখার পাতা জুড়ে দিতে হবে। এতে তাদের কাজকর্ম একটি বইয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে। অঙ্ক এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই এই একই নিয়মে পুস্তক তৈরী করা উচিত হবে।

কিণ্ডারগার্টেন থেকে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচী

শ্রেণী—	বয়স (বছর)	বিষয়
কে. জি.—১	৪	বাস্তব খেলার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে তোলা, বর্ণপরিচয়, সংখ্যা গণনা। ইতিহাসের ছোটগল্প ও ছড়া।
কে. জি —২	৫	বাস্তব খেলা চলবে, আবৃত্তি, ছোটগল্প ও ছড়া, যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ, ভূগোলের প্রথম স্তর, ফুল, ফল, পাতা, গাছ সম্বন্ধে পরিচয়, বাক্য বলা ও লেখা, শব্দ ও অর্থ, মাতৃভাষা ও ইংরাজী বা হিন্দীতে অক্ষর জ্ঞান ও শব্দার্থ।
প্রিপেরটরী	৬	শব্দ বানানো, বাক্যগঠন, ছোটগল্প লেখা। অঙ্ক ও ভূগোল, একসঙ্গে মাতৃভাষা ও ইতিহাস, ইংরাজী বা হিন্দীতে কথোপকথন এবং বাক্য গঠন (একসারসাইজ বই থাকবে)
প্রাথমিক শ্রেণী	৭-৯	মাতৃভাষার মাধ্যমে মাতৃভাষা ও ইতিহাস (একটি বই), অঙ্ক, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান (কৃষি, স্বাস্থ্য, নাগরিক ভদ্রতা, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়) মাতৃভাষার ব্যাকরণ ও অনুবাদ (একটি বই), ইংরাজী বা হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ ও অনুবাদ (একটি বই) ভদ্রতা ও স্বাস্থ্যের উপর বাস্তব (Practical) শিক্ষা।

এই পর্যন্ত আলোচনার ভিত্তিতে লেখকের পরামর্শ এই যে. আমরা উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার পাঠ্যসূচী পরিবর্তন বা শিক্ষাপদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির বদল করার কাজে হাত দেবার আগে, যেন শিক্ষা সমস্যার মূল কি তা ভাল ভাবে কিন্তু দ্রুত

অনুসন্ধান করি এবং তারপরই পরিবর্তনের চেষ্টা করি। প্রথমে যদি কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক স্তরের ত্রুটীগুলি দূর করি এবং পূর্বোল্লিখিত উপায়ে এর প্রতিবিধান করি তবে আমাদের সমস্যা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এর ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির অনেক গলদ দূর হয়ে যাবে। আমরা প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরালে দেখি যে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা থেকে শিশুদের মনোযোগ সরিয়ে দিয়েছে। এর কারণ একদিকে অকারণ পড়ার বোঝা এবং অপরদিকে ত্রুটীপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি। পাঠ্যসূচীতে অকারণ বাহুল্যের ফলে শিশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা প্রকাশ পায় না – তাদের ঝোঁক থাকে কোন মতে বই মুখস্থ করে উত্তীর্ণ হবার দিকে। লেখক এই কারণেই একটি বয়সভিত্তিক পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন এবং তা আগেই দেখান হয়েছে।

পূর্বে যে কয়েকটি কিণ্ডারগার্টেন বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উল্লেখ করা হয়েছে – এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বাহ্যিক জাঁকজমক অথবা নামের বা সম্ভ্রান্ততার পরিচিতির জন্যই বিশিষ্ট – এই কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষণ মানের বিচার করে কোন বিশেষত্ব বোঝান হয়নি। সুইডেন বা সুইজারল্যাণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের যোগ্যতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সে সব দেশে শিশুদের মনস্তত্ত্বের উপর শিক্ষকদের বিশেষ দখল আছে। শিক্ষকরা প্রথম থেকেই শিশুর প্রবণতার উপর মনোসংযোগ করেন। কোন্ শিশুর কোন্ বিষয়ে দখল জন্মাচ্ছে, কোন্ বিষয়ে বুঝতে পারছে না এবং কেন পারছে না, মনোযোগ আছে কি নেই, অসুবিধা কোথায় হচ্ছে এইগুলি শিক্ষকরা খুবই খুঁটিয়ে দেখেন। ছাত্রের সুবিধা অসুবিধাগুলি বুঝতে পেরে সাহায্য করতে পারার ফলে ছাত্রের উন্নতি কোন ভাবে হওয়া সম্ভব তিনি তা ধারণা করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী প্রোগ্রেস রিপোর্ট যথাযথভাবে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে ছাত্রও ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে যেতে পারে। শতকরা চারটি বা পাঁচটি ছেলে সব সময়ই ভাল করে। শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু শতকরা চার পাঁচ জনকেই উন্নত করা নয় - বরঞ্চ বাকীগুলিকে টেনে তোলা।

আমরা যদি আমাদের দেশের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও শিক্ষকের মান ও অবস্থার দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখতে পাই যে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, তাঁরা শিক্ষাদানের যোগ্য পরিবেশ বা জিনিস পান না এবং সর্বোপরি শিক্ষককে তাঁর পেশায় দক্ষ করে তোলে এমন গুণগুলিই তাঁদের শেখানো হয় না।

তাঁদের আর্থিক অবস্থাও এমন যে শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাদানকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটেছে—আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় অবশ্য এই মন্তব্যের আওতায় আসে না।) পেয়েছি অবাঞ্ছিত শিক্ষক—যে শিক্ষক পড়াতে পড়াতে তাঁর গরু কিংবা ছাগল চলে গেল কিনা তা দেখার জন্য প্রায়ই মাঠে হাওয়া হয়ে যান। অথবা জীবিকার জন্য দায়সারা কিছু করেই প্রাইভেট টিউশনী করতে চলে যান।

এ পর্যন্ত আলোচনার ভিত্তিতে লেখকের পরামর্শ এই যে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক বাছাই শক্ত মনোনয়নের ভিত্তিতে করতে হবে। বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের যথেষ্ট পরিমাণ খেলার জায়গা থাকা দরকার। বিদ্যায়তনগুলিরই অনেকাংশে দায়িত্ব নিতে হবে, নিয়মিত ভাবে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ও অপুষ্টির হাত থেকে তাদের বাঁচানোর, সাথে সাথে শিক্ষকদেরও এমন বেতন হতে হবে যা তাদের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। কত ছাত্রকে তারা বিদ্যালয় থেকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলেন এবং উত্তীর্ণ করাতে সক্ষম হন, তার উপর নির্ভর করে শিক্ষকদের বাড়তি ভাতা দিয়ে পুরস্কৃত করে উৎসাহ প্রদানের বন্দোবস্ত করতে হবে।

K G এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাছাই করা বিশেষ কতকগুলি নিয়মের ভিত্তিতে করতে হবে। মনোনয়নের নিয়মগুলি নিম্নলিখিত হওয়া উচিত অর্থাৎ শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলে যে নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা হল—

(ক) শিশুশিক্ষার প্রণালী ও শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও উদার মানসিকতা।

(খ) শিশু-মনস্তত্ত্ব বোঝা।

(গ) যে প্রণালীর সাহায্যে ছাত্রদের পড়াশোনার উন্নতির দিক্ নির্ণয় করা এবং তাদের উচ্চতর শিক্ষার বিশেষ প্রবণতা আছে কিনা তা স্থির করা যায় ও সেই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনও করা যায়, সেই প্রণালী বা বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষকের সবিশেষ পরিচয়।

এই যোগ্যতাগুলি বিচার করার জন্য অবশ্যই এক বা অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের সংস্থা গঠন করতে হবে এবং দরকার বোধ করলে পরীক্ষামূলক পড়ানোর ভার দিয়ে দেখতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যম

একটি নির্দিষ্ট ভাষার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি লাভ করা ও বজায় রাখা জাতির উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অর্থাৎ সমগ্র জাতির উন্নতির এই মহত্তর উদ্দেশ্যকে মনে রেখে চিন্তা করলে, শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয়। যেহেতু শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য উদার মানসিকতা গড়ে তোলা, সেহেতু শিক্ষার শুরুতে সবরকম সঙ্কীর্ণতাকে এড়িয়ে চলতে হবে। ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন আচার ব্যবহারের মানুষ আছে। এদের সকলের সমন্বয়ে আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় সংহতি সাধন করতে হলে একটি সহজ ও মোটামুটি সাধারণ (common) ভাষার মাধ্যমে সকলের মধ্যে খানিকটা সমতা আনতে হবে। তবে সকলের জন্য সাধারণ একটি ভাষা এই প্রকারে প্রয়োজনীয় হলেও কখনোই মাতৃভাষাকে অবহেলা করা যায় না। সুতরাং জাতীয় স্বার্থে একটি সাধারণ ভাষা ও মাতৃভাষা উভয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পাঠ্যসূচীতে কার কতটা দাবি সে বিষয়ে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। কে.জি. এবং প্রাথমিক শ্রেণীতে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলেও সাথে সাথে অপর একটি সাধারণ ভাষা (হিন্দী বা ইংরাজী) শুরু করলে, মনে হয়, ঠিক হবে। তবে লেখকের মতে এই সাধারণ ভাষা হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবি ইংরাজীর অনেক বেশী। প্রথমত ইংরাজী নানান্ ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় সভ্যতায় বিগত একশো পঞ্চাশ বছর ধরে নিজের স্থান করে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত এটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। আজকের দিনে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারের ফলে পৃথিবী ক্রমশ : ছোট হয়ে আসছে, যখন মানবসভ্যতা ক্রমেই বেশী বিজ্ঞানসম্মত ও যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, তখন ভারতে ইংরাজী ভাষার বিস্তার ও স্থায়িত্বকে সাহায্য করা উচিত। তা না হলে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতা থেকে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমের অভাবে অপর পক্ষে হিন্দীও জোর করে চালানো উচিত নয়, কারণ জোর করে আনুগত্য স্বীকার করানো যায় না, বরঞ্চ জোর করলে জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হবারই আশংকা।

শিক্ষার সময়সূচী কি হওয়া উচিত

আমরা ভূমিকাতেই আলোচনা করেছি যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরিবর্তন চান। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সময়সূচীর পরিবর্তনও অনেকে চান।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কত দীর্ঘ হবে এবং কত বৎসর থেকে কত বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে ও তার যুক্তিযুক্ততাই বা কি, তা এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়। যোগাযোগ-পদ্ধতির দ্রুত বিবর্তন এবং পরিবহণ ব্যবস্থা দ্রুততর হওয়ায়, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিস্তার আজ বিশাল। সেই সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার দ্রুত উন্নতি হওয়ার ফলে মানুষ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে আগের তুলনায় অনেক দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক চাপের ফলে মানুষের গ্রহণক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিশুদের গ্রহণ-ক্ষমতা বয়স্কদের থেকে বেশী হওয়ায় গ্রহণ তারা করছেও অনেক তাড়াতাড়ি। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন বজায় রাখবার ক্ষমতা গড়ে তোলা আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। ২৫ বছর আগে ৮।৯ বছরের ছাত্র যে শিক্ষামান অনুসরণ করতো, যা জানতো, বা বুঝতো এখন শহরাঞ্চলের ৪।৫ বছরের শিশু তা শিখে থাকে। সুতরাং ১৯৭২ সালের একটি পরিণত শিশুর মানসিক বয়স ১৯৪৭ সালের একটি শিশুর থেকে ৪ বছর বেশী। এইভাবে গ্রহণক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও, জটিলতাও ২৫ বছরে আগের তুলনায় এখন অনেক বেশী ও দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞান এবং কারিগরি উন্নতির ফলে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিণত মানসিক অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিক্ষা। গুরুত্ব দেওয়া উচিত শিক্ষার সুদৃঢ় মৌলিক ভিত্তি তৈরী করার উপর। যথেষ্ট সময়ও নির্দিষ্ট করা উচিত শিক্ষার কোন দিকে শিশুদের প্রবণতা ক্ষমতা ও বুদ্ধি তা যাচাই করতে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে শিশু তার ৪ বছর বয়সে কে. জি. বিদ্যালয়ে ঢুকবে এবং ৬ বছর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম এই বিদ্যালয়েই চলবে। ছাত্র বা ছাত্রী যখন ৬ বছরে পড়বে তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাবার জন্য নিজেকে তৈরী করবে। এবং ৬ বছর পূর্ণ হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে।

এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন বছরের শিক্ষাসূচী গ্রহণ করা হবে। এইভাবে যখন ছাত্র ৯ বছরের হবে তখন সে দ্বিতীয় প্রিপারেটরী স্তরের ছাত্র হবে। এই প্রিপেরটরী স্তরে সাধারণ বিষয়ের শিক্ষাসূচী সকলের জন্য সমান রাখা হবে। এই সময় সাধারণ বিষয় থাকবে অঙ্ক, ভূগোল, ব্যাকরণ, অনুবাদ এবং কয়েকটি বিশেষ বিষয় (ঐচ্ছিক) যেমন গল্পচ্ছলে রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা বাণিজ্য বা কলাবিদ্যা এর যে কোন দুটি প্রাধান্য পাবে। এই প্রিপেরটরী স্তরে ছাত্র তিন অথবা দরকার অনুযায়ী ৪ বছর কাটাবে (১০ থেকে ১২ কিংবা ১৩ বছর)। যখন ছাত্রের ১২ কিংবা ১৩

বছর বয়স পূর্ণ হবে তখন সে প্রিপারেটরী স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরের একটি বিশেষ শাখায় (প্রবণতা অনুযায়ী) প্রবেশ করবে এবং এই স্তরে আরো ৩ বছর অতিবাহিত করলে ছাত্রের বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ।

বস্তুত পক্ষে প্রিপারেটরী স্তরে ছাত্র যে তিন বা চার বছর অতিবাহিত করবে সেইসময় ছাত্রের পূর্বের প্রবণতা বা ঝোঁক-এর কোন পরিবর্তন ঘটলে অথবা অন্য কোন বিষয়ে নতুন গুণ জন্মালে বা উন্নতি ঘটলে তার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার কোন শাখায় যাবে তা ঠিক করা হবে। প্রিপারেটরী স্তরে বিশেষ বিষয়টি বদলানোর সুযোগ থাকবে। এই তিন বা চার বছরে ছাত্রের প্রবণতা উন্নতি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে ছাত্র কলা, সূক্ষ্মকলা, বাণিজ্য, উন্নত বিজ্ঞান বা প্রাথমিক কারিগরি বিদ্যা, কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগের কোন বিদ্যাটিতে পরবর্তী কালে শিক্ষিত হবে তা নির্ধারণ করা উচিত।

এরকম বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত থাকায় ছাত্ররা নিজেদের পছন্দ বা আকর্ষণ অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থার ফলাফলও হবে ত্রিমুখী। প্রথমত যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত তারা সে সুযোগ পাবে। অপর এক দল যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাথমিক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সর্বোপরি পরীক্ষা পরিচালনা-ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে আসবে। এছাড়া কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্রাধিক্য কমবে ও উৎপাদন সংস্থাগুলিও এই পদ্ধতিতে যথোপযুক্ত দক্ষ লোক পাবে।

অবশ্য এইভাবে নিছক ছাত্রের বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে, শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ছাত্রসমাজকে বিভক্ত করার ফলে কিছু অবাঞ্ছনীয় মানসিক প্রতিক্রিয়া ছাত্রসমাজ তথা সমস্ত সমাজেই প্রতিফলিত হতে পারে। ঐতিহ্যানুযায়ী ভারতবর্ষে অকর্মণ্য, অলসেরও সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকে যদি সে জন্মসূত্রে হয় অর্থসম্পদে বিত্তশালী নয় যদি যেন তেন প্রকারেণ তার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি এই হওয়ার ফলে অতীতে এবং এখনও দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে। এখন শ্রমের মর্যাদাদানে সামাজিক সকল স্তরেরই সমান ভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যখন বিভিন্ন শাখায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়ার ব্যাপারে বাছাই-এর প্রশ্ন ওঠে, তখনই এই শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করা যায়। এই সচেতনতা সমাজে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে এক সাথে আসা দরকার, নইলে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী প্রাথমিক কারিগরি শিক্ষার

মান ডিগ্রী কোর্সের মানের সমতুল্য না হতে পারে কিন্তু উৎপাদন এবং চাকুরী ক্ষেত্রে এই কারিগরি শিক্ষা সমমানের এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চমানেরও হতে পারে। যাদের বুদ্ধি কম তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায় না এরকম ধারণা সমাজে প্রচলিত। ক্ষিপ্র এবং ধারাবাহিক প্রচার ব্যবস্থার সাহায্যে এ ধারণার অবসান ঘটিয়ে এই সব ছাত্রদের যাতে উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং সমাজে পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করা হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই প্রচার-পরিকল্পনাটি যদি ভেঙে যায় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অতীতের সামাজিক বিশৃঙ্খলারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি

কে. জি. স্তরে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের, পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে বুঝতে না দিয়ে, পরীক্ষা নেওয়া উচিত। এই পদ্ধতিতে শিশুর আত্মপ্রকাশ বেশী হয় ও তার ভঙ্গী হয় সাবলীল। তাছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে ওঠে। অপরপক্ষে পূর্বঘোষিত পরীক্ষায় শিশুর প্রকাশভঙ্গী ও সামগ্রিকভাবে সে নিজে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং পূর্বঘোষিত কঠিন পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রকে অভ্যস্ত করানোর আগে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে হবে।

ক্রমশঃ ছাত্র যখন নীচু শ্রেণী থেকে উঁচু শ্রেণীতে ওঠে তখন পরীক্ষা পদ্ধতিতেও আরও নিয়ম-শৃঙ্খলা আনা হবে। কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক স্তরে খেলা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিক পরীক্ষাগুলি নেওয়া উচিত। এরপর আরো উচ্চস্তরে গেলে নিয়মিত প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে। পরীক্ষাসূচীর মধ্যে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় এবং এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার।

অধিকাংশ শিশুরই ভীতি অঙ্ক। কিন্তু এই কারিগরি ও বিজ্ঞানের যুগে, শত ভয় পেলেও অঙ্ককে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এরকম ভীতি থাকলে অঙ্ক আয়ত্ত করাও সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে অঙ্ক যেভাবে শেখানো হয় তাতে ছাত্র, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বা প্রযুক্তিবিদ্যায় কোন অঙ্কর প্রয়োজন কোথায় কতটা তাও জানতে পারে না। জীবনে অঙ্ক জানার উপকারিতা বা জীবনে অঙ্কের ভূমিকা, কোনটাই বুঝতে পারে না। ভাষা শেখানোর সময় বলা যেতে পারে "তোমার প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, অপরকে বুঝতে ভাষা

প্রয়োজন"। তেমনি কোথায় কোন জিনিষ কেমন করে ঘটেছিল বা আছে, জানাতে ইতিহাস বা ভূগোল পড়ানোর যাথার্থ। তেমনি শিক্ষার মধ্যে অঙ্কের উৎস বা প্রয়োজনীয়তা কি সেই সম্পর্কে ছাত্রর বোধগম্য একটি পরোক্ষ প্রমাণ বা উপমা থাকা চাই।

Practical Mathematics শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে প্রথমে ছাত্রর আত্মবিশ্বাস গড়ে তুললে, পরে ছাত্র Simple abstract problem অনেক সহজে সমাধান করতে পারবে। পরীক্ষার সময় অঙ্কর উত্তর থেকেও জোর দেওয়া দরকার সমাধানের পদ্ধতির উপরে। ভাষার ক্ষেত্রে, বাক্যগঠন বিশুদ্ধ ব্যাকরণগত উপায়ে ভাবপ্রকাশ ইত্যাদির বিচারই পরীক্ষার নিয়ম হওয়া উচিত।

"শিক্ষার পাঠ্যসূচী এমন হওয়া কাম্য যার কার্যকারিতা শুধু মনে রাখাতেই সীমাবদ্ধ নয়, দৈনন্দিন এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও যাকে কাজে লাগানো যায়।"

ব্যাখ্যা সহকারে এই যুক্তিটিকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞানশাখায় ছাত্রদের পাঠ্যসূচীতে আছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত (জীববিদ্যা বা অন্য কোন একটি বিজ্ঞান বিষয়) সঙ্গে ইংরাজী, হিন্দী অথবা মাতৃভাষা (জোর থাকবে ব্যাকরণ, অনুবাদে ও লেখায়), এছাড়া আছে সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল।

এর মধ্যে প্রধান বিষয় হচ্ছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত এই সব বিজ্ঞান বিষয়গুলি, কিন্তু এদের যে কোনটিকে লিখে বা কথায় প্রকাশ করতে গেলে ভাষা অপরিহার্য। সুতরাং এই তিনটি এবং যে কোন দুটি ভাষা, তার ব্যাকরণ এবং অনুবাদের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধু এই নয়, পরীক্ষার সময় অহেতুক পড়ার বোঝা থাকার ফলে ছাত্ররা এই সমস্ত প্রধান বিষয়গুলিতে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে পারে না, ফলতঃ পাশ করার তাগিদে জ্ঞান আহৃত হয় সামান্যই। এই কারণে বছরের প্রথম থেকে প্রধান বিষয়সমূহ পড়ানোর সাথে সাথে বাকী বিষয়গুলির মাসিক অথবা পাক্ষিক পরীক্ষা নিয়ে নিলে বার্ষিক পরীক্ষার সময় বাকা থাকে শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, এবং ভাষা, অর্থাৎ প্রধান বিষয়সমূহ। ছাত্ররা প্রধান বিষয়গুলি ভালভাবে আয়ত্ত করার সময় পাওয়ার দরুন পড়ায় বেশী আগ্রহী হয়ে ওঠে। এইভাবে ব্যক্তিগত বুদ্ধি বা যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় আশানুরূপ ভাবে। Britain এর Nuffield research-experiment-এ দেখা যায় এই ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব কাজের হয়েছে।

বর্তমান যুগে ছাত্রদের সামনে সীমিত পাঠ্যসূচীর বাইরেও নানারকম আকর্ষণীয়

ও একই সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। উৎসুক ছাত্রের জন্য এই সব বিষয়কেও সুশৃঙ্খলিত উপায়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে প্রাধান্য দিতে হয়, যাতে তাদের উৎসুক্য, জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত হয়। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে যদি বার্ষিক পরীক্ষার বিষয়সূচীতে দশটি বিষয় স্থান পায় তাহলে ছাত্রেরা পরীক্ষা নামক গণ্ডী অতিক্রম করতে যতটুকু তৈরী হওয়া প্রয়োজন তাতেই তার সমস্ত আগ্রহ ও ক্ষমতা ব্যবহার করবে। এরকম পরীক্ষার ফলে, একনায়কের তরবারির দ্বারা অধিকৃত ভূমিখণ্ডের উপর অধিকার যেমন ক্ষণস্থায়ী হয়, ঠিক তেমনি জোর করে লব্ধ জ্ঞানের উপর ছাত্রের ক্ষণস্থায়ী দখল থাকে। ছাত্রদের এই বিস্মরণের ফলে সময়, অর্থ, ও শক্তি ব্যয় অহেতুক হয়ে যায়। কোন উপকারই হয় না ছাত্রের বা তার পরিবারের তথা সমস্ত সমাজের। সুতরাং পূর্বউল্লিখিত পরিকল্পনা অনুসারে প্রধান বিষয় সমূহের উপরে জোর দেওয়া হলে, মহামারীর মতো যে মানসিক অস্বস্তির বোঝা বিদ্যালয় ও কলেজ সমূহে বিরাজমান, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। যাইহোক এরকম একটি বিষয় যার আলোচনার পরিধি বিশাল ও সে আলোচনাকে কার্যকরী করা আরো কঠিন তার আলোচনা বা সে সমস্যার সমাধান কয়েকটা কাগজে লিখে শেষ করা যায় না।

উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায় পরবর্তী স্তর (২ বছর)

১৬ বা ১৭ বছর বয়স এই পর্যায়ের আদর্শ সময়। এই সময় প্রতিটি শাখার পাঠ্যসূচী আরো গভীর হবে এবং কিছু সাধারণ বিষয় বিভিন্ন শাখার মধ্যে সম্বন্ধ বজায় রাখতে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যেমন বিজ্ঞান শাখার পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্য শাখার দুটি বিষয়ও স্থান পাবে। তবে এই বিষয়গুলি auxiliary থাকবে এবং বছরের প্রথম ছ মাসের মধ্যে এই বিষয়গুলির অধ্যয়ন শেষ করতে হবে। উপরন্তু ব্যাকরণ, অনুবাদ এবং সাধারণ জ্ঞান প্রধান পাঠ্যতালিকার অংশ বলেই গণ্য করা হবে। তবে এ দুটি বৎসরের শিক্ষাকাল স্কুলে হবে না কলেজে হবে তা নির্ভর করবে, স্কুল বা কলেজের সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত আছে কিনা তার উপর এবং লেখকের চিন্তানুযায়ী এই দুটি বৎসর এর যে কোন একটিতে রাখা যাবে। এপেক্স বোর্ডে একটি শাখা থাকবে—যাদের উপর এগুলি দেখাশোনার ভার থাকবে। কিন্তু পাঠ্যসূচী নির্ণয়, পরীক্ষার দিন ধার্য করা, প্রশ্নপত্র তৈরী, পরীক্ষা কেন্দ্র স্থিরকরণ, পরীক্ষা পরিচালন, উত্তর পত্র পরীক্ষা, মার্কসীট তৈরী ও ফলাফল বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সমস্ত কাজই আগেকার পদ্ধতিতে হবে এবং আঞ্চলিক বোর্ডও অংশ গ্রহণ করবে।

(২)

ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতে বর্তমান সমস্যা সংক্রান্ত এই আলোচনার প্রথম পর্বে বর্তমান লেখক জোর দিয়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষার দৃঢ় বুনিয়াদ গঠনের আলোচনাতেই। এর ফলে শিশু এবং সমাজ উভয়ই সাধারণভাবে কিরকম উপকৃত হবে তারও আলোচনার চেষ্টা তিনি প্রথম পর্বে করেছেন।

এই পর্বে লেখক আগ্রহী হচ্ছেন শিক্ষক, ছাত্র এবং পাঠ্যসূচী ও সর্বোপরি স্কুলের পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক ত্রিমুখী সম্বন্ধ রয়েছে তার আলোচনায়। বিদ্যালয় বা কলেজ এবং শিল্প, কৃষি ও বিভিন্ন পেশার মধ্যে যে বাহ্যিক সমন্বয় বিদ্যমান তাও তিনি এই অংশে দেখাতে চাইছেন।

শিক্ষক

বিদ্যালয় এবং কলেজ সমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার কর্ণধারদের মনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে, যে একজন ভাল শিক্ষকের প্রথম শ্রেণীর (1st class) ডিগ্রী থাকতেই হবে, কিন্তু লেখক বিদেশে U. K এবং U. S A এর শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, সেই শিক্ষকই একজন ভাল শিক্ষক যিনি ছাত্রদের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচিয়ে নিজের ছাত্রদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়েছেন এবং নিজের কাজ করতে গিয়ে যিনি সমাজেও খুব সাদরে গৃহীত হয়েছেন। এছাড়া দেশে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করার পরীক্ষায় পরীক্ষক হিসাবেও লেখক এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছেন যে, আবশ্যক ভাবে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রীধারী শিক্ষকই সর্বক্ষেত্রে আদর্শ নয়। গত ১০ বছরের শিক্ষক নিয়োগের ইতিহাসে কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রীধারীর শিক্ষক পদে নিয়োগই, এ সত্য প্রমাণ করেছে।

শিক্ষক পদে মনোনীত হবার দ্বিতীয় গুণগত যোগ্যতা হল, শিক্ষাদানের প্রতি শিক্ষক পদ-প্রার্থীর আকর্ষণ। শিক্ষক নিয়োগের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে, এই যোগ্যতা আছে এমন একজনকে, বর্তমানে লেখক পরীক্ষক হিসাবে নানা ভাবে পরীক্ষা করে ও অপরাপর পরীক্ষকদের মতের বিরুদ্ধে শিক্ষক পদে নিয়োজিত ক'রে, কেমন সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, সেই উদাহরণ এইখানে দেওয়া যেতে পারে। সেই তিন বছর আগের লেকচারার পদপ্রার্থী একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট-ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রীধারী ছিলেন। তখন তিনি একটি শিল্প সংস্থার

টেক্‌নিক্যাল সেলস্ রিপ্রেসেনটেটিভ পদে ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত বেতনের দ্বিগুণ উপার্জন করছিলেন। এই প্রার্থীকে পরীক্ষা করার প্রথম দিকে তিনি নিজের পেশার কতখানি মনে রাখতে পেরেছেন এবং সেই পদে তিনি তখন কি করেছিলেন, তাঁর সামাজিক আচার আচরণ, ছাত্রদের জন্য তাঁর প্রকৃত দরদ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা ইত্যাদি শিক্ষক হিসাবে মনোনীত হবার অনুকূলে কিনা, তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়েছিল। এছাড়া শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করার কতটা উপযুক্ত তাঁর স্বভাব বা তা প্রকৃত আছেই কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল বৈকি। বর্তমান প্রতিবেদক বোর্ডের অপরাপর পরীক্ষকদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও এই প্রার্থীর নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। এই বিশেষ প্রকৃতির নিয়োগের কারণ হিসাবে অপর পরীক্ষকদের কাছে উল্লেখ করা হয় যে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে এরকম experiment অর্থাৎ এরকম অন্য পেশার লোক, শিক্ষক হিসাবে কতখানি ঠিক তা দেখার প্রয়োজন আছে এবং এর ফলাফলও ২।৩ বছরের আগে বোঝা যাবে না। বর্তমানে সেই লেকচারার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসারের পদে উন্নীত হয়েছেন এবং ছাত্ররা তার কাছে এত স্বাভাবিক ভাবে ও সহজে আসে, যে দেখলে মনে হয় দুজন সহকর্মী একসঙ্গে বসে আলোচনা করছেন। তিনি আজ একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছেন, যিনি শুধু প্রাথমিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিশেষ বিষয়ের মৌলিক উপাদানগুলিই বোঝাতে পারেন তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর বাস্তব জীবনেও সে শিক্ষাদান যাতে কার্যকরী হয়, তেমন শিক্ষাই দান করে থাকেন। এ শুধু একটা উদাহরণ। কিন্তু লেখক নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে এরকম বহু প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষাজগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে আছেন। আমাদের ঘংস্কার ও ডিগ্রীর ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করার এক ভ্রান্ত অহমিকা বোধের জন্য এমন ঘটছে।

বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় শিক্ষকদের বেতন মোটেই আর্থিক-ভাবে লাভজনক নয়। যথার্থ ব্যক্তি আকর্ষণ করার জন্য, এ সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। এই পরিচ্ছেদে শিক্ষক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনার সমাপ্তি টেনে একথাই বলতে পারি আজকের সভ্যতা চালাতে যেমন শক্তির প্রয়োজন তেমনি দরকার শিক্ষকের আজকের সভ্যসমাজ গড়ে তুলতে, যা আমাদের পরম আকাঙ্খিত বস্তু ও যার জন্য আমরা প্রতিনিয়তই কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ছাত্র

শিক্ষাব্যবস্থায় এই ত্রিমুখী সমন্বয়ের দ্বিতীয় উপাদান হল ছাত্র। শিক্ষার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ও সাহস আনয়ন করে ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই কেমন করে উঁচু ক্লাসের জন্য তৈরী করে দেওয়া হয় অথবা কি রকম শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষার সময় অন্যায় ব্যবস্থার শরণাপন্ন না হওয়া নিয়মানুবর্তী ছাত্রসমাজ আমরা পেতে পারি, তা লেখকের আলোচনার পূর্ববর্তী পর্বে দেখানো হয়েছে।

শিশুদের আচার-ব্যবহার বয়স্ক লোকের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে দেখলে চলবে না। গঠনের সমমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাও উচিত নয়। বরঞ্চ বয়স্কদের শৈশাবস্থার মানসিকতার সঙ্গে তুলনা করে শিশুদের সঙ্গে অনেক নিপুণ ও কোমল-ভাবে ব্যবহার করতে হবে। বর্তমান দ্রুত জীবন ধারার সাথে সাথে বয়স্কদের স্বার্থকেন্দ্রিক, জটিল চিন্তাধারা তাদের অধৈর্য করে তুলছে শিশুদের শিক্ষা ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগদানে। ফলে শিশুর শিশুসুলভ স্বাভাবিক গুণগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

যেমন দুটি বয়স্ক লোকের আচার-আচরণ এক রকম হয় না, ঠিক তেমনি দুটি শিশুর ক্ষেত্রেও উভয়ের কাছ থেকে একই ধরনের ব্যবহার আশা করা যায় না। অনেকটা এই প্রসঙ্গেই লেখক আলোচনার প্রথম পর্বে আলোচনা করেছেন যে এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব শিশুকে বোঝার ব্যাপারে অনেক। শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু পুঁথিগত বিদ্যার সাথে শিশুর যোগাযোগ ঘটিয়ে ও শিখিয়েই শেষ নয়, প্রতিটি বিভিন্ন শিশুর মানসিকতার সাথে পরিচিত হয়ে, শিক্ষকের এবং শিশুর ছোট মনের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোও শিক্ষকের দায়িত্ব। আজকের এই নিদারুণ হতাশাভরা অবস্থার দিকে দৃষ্টি ফেরালে, আমরা দেখি যে যেহেতু শিক্ষকেরা খুব নিম্নহারের বেতনে নিযুক্ত হন, তাঁরা অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন পন্থার শরণাপন্ন হন। ফলে তাঁদের মন এককভাবে শিক্ষাদানের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়। ফলে শিশুরা, ছাত্ররা সকল স্তরে অবহেলিত হয়।

এছাড়া আজকের ভারতবর্ষের বড় বড় শহর ও আশেপাশের অঞ্চলের ছাত্রসমাজের আরেকটি বিপজ্জনক বিশেষত্বও নজরে পড়ে। ধর্মাধর্ম জ্ঞানহীন রাজনীতিবিদ্‌রা শিক্ষকদের এই দৈন্যাবস্থার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করছে। শিক্ষকেরা অবস্থার চাপে বিকৃত রাজনীতির বলি হচ্ছে। ছাত্রেরা, যাদের মানসিকতা, চরিত্র, শিক্ষা সবই একটা গঠন পদ্ধতির (Process) মধ্য দিয়ে চলছে, যাদের

মন নরম ও সবুজ, তাদের কাছে শিক্ষকরাই আদর্শ। এই শিক্ষকরাই পরিস্থিতির চাপে ছাত্রদের উৎসাহিত করছে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে। এ দৃশ্য ও তার বিষময় ফলাফলও সর্বজন বিদিত।

যাই হোক, সমস্ত ব্যাপারটাই মরুভূমির মতো আশাহীন অবস্থায় পতিত হয়নি। মরুভূমিতে যেমন মরুদ্যান আছে, তেমনি এই আপাত নিরাশ অবস্থার সমাধানও আছে। এ মরুদ্যানও বিনষ্ট হবার পক্ষে বিঘ্নকারী উপাদান হল সমাজের স্বার্থান্বেষী, প্রভাবশালী সেই সব লোক, যারা স্থানীয় রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা বা লোকের সমর্থনে (যাদের নিজেদের স্বার্থও যথেষ্ট আছে) সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা বা সরকারের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। লেখক এবং আরো অনেকে এরকম অভিজ্ঞতারও উদাহরণ দিতে পারেন।

শিশুরা শিখতে উৎসুক। তাদের শিক্ষাকে ঠিক রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেই তারা শিখবে। একটি অঙ্ক ক্লাসে, শিক্ষক কিছু গুণ অঙ্ক বোর্ডে ক'রে এবং ছাত্রদেরকে 'তারা যদি ধারাপাত মুখস্থ রাখে, তবে সহজেই গুণ অঙ্ক করতে পারবে' একথা ব'লে কর্তব্য সারলেন। এই ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই বুঝতে পারলো না ধারাপাতের সঙ্গে গুণ অঙ্কের যোগাযোগ কোথায়। এস্থলে শিক্ষকের উচিত ছিল হাতেনাতে গুণ অঙ্ক ধারাপাতের সাহায্যে যেভাবে করতে হয় করিয়ে, দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিয়ে দেওয়া। ফলে শিক্ষাদান ও গ্রহণ দুইই সহজতর হ'ত। কিন্তু এখানে ঘটল এই যে বাড়ী ফিরে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই বাবা, মাকে বলতে পারলো তারা গুণ অঙ্ক শিখতে শুরু করেছে, যদিও তারা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে নি।

বিদ্যালয়ের সাধারণ পরিচালনা-ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের বড় বড় শহরের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছে।

প্রথমত কল্পনা করা যাক যে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তির নিয়মাবলী জানতে যাওয়া হয়েছে। সেখানে যে অবশ্যম্ভাবী সমস্যার মুখোমুখি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হতে হয় তা হল যে সেখানে কথা বলার বা প্রয়োজনীয় প্রাথমিক খবরাখবর সরবরাহ করার কেউ নেই। যদি বা অনুসন্ধান করে কাউকে বার করা গেল, তাও কোন কাজে লাগল না। বড় জোর সেভাবে এ ঘর থেকে ও ঘরে সময় নষ্ট করে সামান্য কয়েকটি খবরের জন্য ঘুরতে হল। যদি কেউ সত্যই যথেষ্ট ভাগ্যবান হয়ে থাকেন

তবে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে বিদ্যালয়ের বড়বাবু বা প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকার দেখা পেতে পারেন। কিন্তু যে ভঙ্গীতে তাঁরা কথা বলেন, বা যে ব্যবহার তাঁরা করেন, তা দেখেশুনে ছেলেমেয়েকে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে দেবার ইচ্ছা আর প্রায় থাকে না। কারণ বাইরের লোকের বা অভিভাবকদের সঙ্গে তাঁদের আচরণে যদি এই হয়, তবে এই বিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা অসামাজিক এবং অসহিষ্ণু নাগরিক হয়ে বেরিয়ে আসবার শিক্ষাই পাবে।

এই কল্পনা বা উদাহরণটিকে আর একটু ব্যাখ্যা করা যাক। যদি কোন অভিভাবক, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে সে খবর সংগ্রহ করে, সেইমত পুত্র বা কন্যাকে তৈরী করে, নির্দিষ্ট দিনে ভর্তির পরীক্ষার জন্য হাজির হয়, দেখবেন যে সেখানে হাজার খানেক প্রার্থী ছেলেমেয়ে ও তাদের দ্বিগুণ সংখ্যক অভিভাবক ঘুরছেন: দেখবেন সে বিদ্যায়তনে ওর অর্ধেক লোকেরও স্থান সংকুলানের বন্দোবস্ত নেই। কোন নির্দেশাবলী কারুর কাছে নেই। কখন পরীক্ষা শুরু হবে তার মাথাব্যথা কর্তৃপক্ষের নেই। তারপর অতিকষ্টে যখন পরীক্ষার ঘর বার করা হল তখন মানুষ শ্রান্ত ও বিরক্ত।

বহু বিদ্যালয়ে দৈনিক পাঠ্যসূচীও নেই। ফলে ছেলেমেয়েরা কি পড়লো। কিইবা শিখলো—তা বাড়ীতে বসে বাবা মার পক্ষে বোঝা দুষ্কর। ঘরে বসে ছাত্রকে কি করে আনতে বলা হয়েছে তার কোন হদিসও পাওয়া যায় না। ফলে ছাত্র সুযোগ পেলো—ফাঁকি দেবার। যদি কখনও কোন বাবা বা মা এই সম্বন্ধে কিছু জানতে চান—তাহলে পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে গিয়েও—বহু সময় অপেক্ষা করে তবেই হয়ত তিনি শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার দেখা পেলেন। ফল হল বাবা কি মায়ের কাজের সময় নষ্ট হল অযথাভাবে। এই ব্যাপারের সুরাহার উপায় হল শিক্ষক বা শিক্ষিকার রোজনামচাগুলি পরীক্ষা করে দেওয়া যাতে ছাত্ররা বাড়ীর কাজ ঠিকমত করলো কিনা তা বুঝতে পারা বাবা কিংবা মায়ের পক্ষে সহজ হবে।

পাঠ্যসূচী

একটি ছেলে বা মেয়ের পড়ার টেবিলের দিকে যদি তার বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় চোখ ফেরানো যায়, তবে দেখা যায় যে সেখানে একটি মাতৃভাষার বই, একটি ইংরাজী বই, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ের বই, স্বাস্থ্য, হিন্দী, ছবি আঁকা ইত্যাদি বিভিন্ন বই রয়েছে। ছাত্ররা

বাড়ী ফেরে শুধু যে ২।৩ ঘণ্টার হোমওয়ার্কের বোঝা নিয়ে তাই নয়, পরের দিনের ক্লাসের জন্য তৈরী হতে হয়। দেখা দরকার এতগুলি বইয়ের কি যথার্থ প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষাগ্রহণের মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছোতে আমরা কি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু ও পরিষ্কার চিন্তাধারা এবং সেই চিন্তাশক্তির যুক্তিসম্মত উপস্থাপনার ক্ষমতা গড়ে তুলছি? না, একটি পাঠ্যবই আগাগোড়া মুখস্থ করে, ঠিক যেমন একটি রোবট তার স্মৃতিতে যা টেপ করে সঞ্চিত আছে, বোতাম টিপলে তাই আবৃত্তি করতে পারে, তেমনি ছাত্ররা তাদের মুখস্থ করা বিদ্যা আগাগোড়া উগরে দেয় তাই কি আমরা চাই? স্বাভাবিকভাবেই আমরা যদি শিক্ষা শব্দটির প্রকৃত রূপ দিতে চাই তাহলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি অত বড় পাঠ্যসূচীর প্রয়োজন নেই। চার/পাঁচটি বইয়ের সমন্বয়ে গঠিত পাঠ্যসূচীই যথেষ্ট হবে, যাতে থাকবে ইংরাজী, ব্যাকরণ, অনুবাদ, মাতৃভাষার ব্যাকরণ ও অনুবাদ, অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞান। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে এরকম একটি সূচীর প্রবর্তন অতি আবশ্যক। ব্যাকরণ ও অনুবাদের সাহায্যে যদি গুছিয়ে যুক্তিসম্মত উপায়ে ছাত্ররা তাদের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যও সাধিত হবে, সাথে সাথে তাদের হোমওয়ার্কও আর বিশেষ করার থাকবেনা। প্রাথমিক স্তরে সময় লাগলেও অঙ্কের মৌলিক ভিত্তিগুলি ভালমত বুঝিয়ে সেগুলির প্রয়োগ করে অঙ্ক শেখাতে হবে। এবং, এ সমস্ত শিক্ষাই স্কুলে সমাপ্ত করতে হবে। সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার সাহায্যে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হবে আবার পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে ভূগোল ও সমসাময়িক উন্নতি সম্বন্ধে, জ্ঞানও হবে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা থেকে। ইতিহাস প্রাথমিক ও প্রিপারেটরী শ্রেণীতে মাতৃভাষায় আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তক করে পড়িয়ে দিলে একটা বইও কমে যায়।

এরকম একটা ব্যবস্থার প্রচলন এই জন্যেই দরকার, যাতে ছাত্র বা ছাত্রীরা ২।৩ ঘণ্টা খেলা ও শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগ পায়। প্রাত্যহিক পড়া যেন তাদের কাছে ক্লান্তিকর একঘেয়ে বিষয়ে পরিণত না হয় সেইজন্য এ ব্যবস্থা। এখন বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই লেখাপড়ায় আগ্রহী নয়, পারলে তারা পড়াকে এড়িয়ে চলে এবং ফলতঃ বাড়ী এবং বিদ্যালয় এই দুইয়ের মধ্যে ক্লান্তিকর উভয় সংকটে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সংকট থেকে বাঁচতে তারা বিভিন্ন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়, ফলে যাদের জন্য এত সময়, শক্তি ও অর্থব্যয় হচ্ছে আমাদের, সেই উত্তরপুরুষরা দুর্নীতিপরায়ণ যদি হয় তবে দোষটা কাদের? লেখকের বিশ্বাস সম্ভবতঃ পাঠ্যসূচী প্রণয়নের মধ্যেও পাঠ্যসূচী প্রণেতাদের বিশেষ কোন স্বার্থ আছে। যাই হোক,

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখকের এই পরামর্শকে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করলে, উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলেই মনে হয় এবং এর ফলে ভবিষ্যতে আমরা সৎ ও সুন্দর নাগরিক পেতে পারি। পাঠ্যসূচীর ভার এইভাবে লাঘব করা হলে পুস্তক লেখক ও প্রকাশকদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে। কিন্তু তাঁরা পরিবর্তে তাঁদের শ্রমকে আরো সৃজনশীল প্রয়াসে নিযুক্ত করতে পারেন যার ফলে, ছাত্রদের জ্ঞানভাণ্ডার তথা মন সমৃদ্ধ হবে ও এমন বই রচনা করতে ও ছাপতে পারেন যা কিনা তাদের অবসর সময়ে পড়ার পক্ষে ও ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার পক্ষে উপযোগী হবে।

ছাত্র যতই উচ্চতর শ্রেণীতে যাক না কেন তাদের সমস্যা বাড়বে না কারণ, তাদের চিন্তাধারা ও প্রকাশের ধরন শৃঙ্খলাবদ্ধ, নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করার উপযোগী করেই গড়ে তোলা হয়েছে। উচ্চতর স্তরে পরিবর্তন মূলতঃ এই যে পাঠ্যবই সরল থেকে ক্রমশঃ জটিল হতে থাকে। অনস্বীকার্যভাবে ছাত্র যত উচ্চতর শ্রেণীতে যায় পাঠ্যবিষয় কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষাকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য বেড়ে যায়। যাই হোক, এই সকল বাড়তি বিষয়গুলি মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাবর্ষের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে শেষ করে, প্রধান বিষয়গুলির উপরেই বার্ষিক পরীক্ষার সময় জোর দিতে হবে। পাঠ্যসূচী প্রণয়নে সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হল প্রচুর অদরকারী বিষয় যেগুলি ছাত্রকে কোনভাবেই জ্ঞানী করে না এবং সামাজিক কোন চাহিদা পূরণ করার উপযোগী করে গড়ে তোলে না, তা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এবং মুড়ি ও মুড়কির মত একইভাবে পরীক্ষা চলে বছরের শেষ পর্যন্ত। অঙ্কের ক্ষেত্রে লেখকের বিশেষ পরামর্শ এই যে পরীক্ষক অঙ্ক খাতায় অঙ্ক করার পদ্ধতির ওপর যেন নজর দেন। যদি পদ্ধতি এবং ফল উভয়ই ঠিক হয় তাহলে ছাত্র পূর্ণ নম্বর পাবে। কিন্তু যদি ফল ভুল হয়, পদ্ধতি ঠিক থাকে, তবে সেই অঙ্কের জন্য ছাত্রের অর্ধেক নম্বর প্রাপ্য।

পরীক্ষা পদ্ধতির পরিচালনা ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের অল্পসংখ্যক কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড ব্যতীত পরীক্ষা পদ্ধতির পরিচালনা ব্যবস্থা বস্তুত ধ্বংস হয়ে গেছে। পরীক্ষা পদ্ধতির পরিচালন ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় তা বিশ্লেষণ করলে পরীক্ষা পদ্ধতি কিসের সমন্বয়ে গঠিত বোঝা যায়:—নিম্নে এই পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তারই নমুনা দেওয়া হল।

উদাহরণ ১) নির্দিষ্ট সময়ে টেস্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশন।

" ২) বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি ও নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশ করা।

উদাহরণ ১) সম্বলিত হয় নিম্নোল্লিখিত চাহিদাসমূহ পূরণের সমন্বয়ে :—

ক) যথোপযুক্ত ও যথাসময়ে প্রশ্নপত্র নির্মাতাদের নির্বাচন।

খ) প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণের সময় সীমা নির্ধারণ।

গ) যথেষ্ট সংখ্যক প্রশ্নসম্বলিত বই তৈরী করা।

ঘ) ঠিক রোল নাম্বার দিয়ে প্রবেশপত্র (admit card) যথাসময়ে (reasonable time) প্রদান করা

ঙ) পরীক্ষা হলে দায়িত্বরত ব্যক্তিকে বেতন দান। (এই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আবশ্যিক যে বিষয়ে পরীক্ষা হচ্ছে সে বিষয়ে জ্ঞানী অথবা উচ্চশিক্ষিতও হতে হবে না)।

চ) পরীক্ষার পর উত্তরপত্র ঠিকমত সংগ্রহ করা।

ছ) যথেষ্ট সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষককে উত্তরপত্র পূর্ণমূল্যায়নের জন্য সংগ্রহ করা।

জ) নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সঠিক Marksheet প্রস্তুত করা।

ফলাফল প্রকাশ করা ইত্যাদি উদাহরণ ১ ও উদাহরণ ২ এর মতো একই পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। এখন দেখা যাক পরীক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থা তাহলে কোথায় ব্যর্থ হয়েছে।

স্বাধীনতার পর দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তুমুল আলোড়ন এসেছে। তখন শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের অক্ষরজ্ঞান অবধি ছিল না। বোঝার উপর শাকের আটির মত আরও লোক এসেছে খণ্ডিত দেশের ওপার থেকে এবং এদের ভেতরে বহু শিক্ষাবিস্তারের স্রোতে এসে পড়েছেন। একে তো স্কুলের অভাব, তার উপর অতি শীঘ্র বিস্তারের প্রচেষ্টা—এই দুয়ের চাপে শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তদুপরি যারা নিঃস্ব ও সর্বহারা তারা সমাজ বা প্রশাসনের কাছ থেকে যখন কোন আশ্বাস পেলো না—তাদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচবার একটিমাত্র পথই খোলা রইল আর সেটি হল সোচ্চার দাবি যার প্রভাব শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এড়িয়ে যেতে পারলো না। যে দূরদৃষ্টি ও সংগঠন বোধ ও ক্ষমতা থাকলে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হ'ত তা নৈতিক অবক্ষয়ের পথ ধরে চলতে লাগলো যার পরিণতি আজ আমরা সমাজের সর্বস্তরে দেখতে পাচ্ছি। এর

ফল প্রতিফলিত হচ্ছে পরীক্ষা পরিচালন ব্যবস্থার উপরেও। পরীক্ষা পরিচালন বন্দোবস্ত পূরা শিক্ষাব্যবস্থারই একটি অঙ্গ এবং অঙ্গের বিকৃতি শিক্ষাকর্তারাও নিরোধ করতে পারলেন না কারণ তাঁরাও সংগঠন শক্তির বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণের উপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেললেন।

আমরা মনে করি এখনও সময় পার হয়ে যায়নি—শোধরাবার সময় এখনও আছে। লেখকের মতে এখন যা দরকার তা হচ্ছে শিক্ষাকে সরকারী কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে আনা এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করা। রাজনৈতিক দল বা মতবাদ নির্বিশেষে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে লেখকের আবেদন তাঁরা যেন একযোগে এই ব্যাপারটার জন্য দাঁড়ান। সরকারী কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে আনবার আগে যা দরকার তা হচ্ছে অঞ্চল অনুযায়ী এক একটি সুসংগঠিত সংস্থা তৈরী করা, যাঁরা অঞ্চলের সমস্ত স্কুলের শিক্ষাপরিচালনা ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবেন। এতে থাকবেন নির্বাচিত শিক্ষকরা, শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদ্‌রা। এই আঞ্চলিক সংস্থা থেকে নির্বাচিত হয়ে এক বা ততোধিক ব্যক্তি এপেক্স বোর্ড তৈরী করবেন। এই এপেক্স বোর্ডের দায়িত্ব থাকবে শাসনপ্রণালীর দিক নির্ণয় করা। এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কার্য ও শিক্ষাপদ্ধতির সম মত তৈরীতে সাহায্য করা।

সরকারের দায়িত্ব থাকবে বিদ্যালয়গুলি ঠিকমত চলছে কিনা তা নিয়মিত দেখার জন্য পরিদর্শকদের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ নেওয়া। এই বিবরণের ভিত্তিতে তাঁরা এপেক্স বোর্ডকে সমস্ত খবর জানাবেন এবং এপেক্স বোর্ড সেই অনুযায়ী অঞ্চল বোর্ডকে নির্দেশ দেবেন। এই খবর আদান-প্রদান হতে হবে অতি দ্রুত—এখানে ঢিলেমীর কোন অবকাশই থাকবে না। এতে বিদ্যালয়ের প্রশাসন খুবই মজবুত হবে।

এই এপেক্স বোর্ডের তিনটি দায়িত্ব থাকবে। একটি হচ্ছে শাসন প্রণালী ও আঞ্চলিক সমস্ত রক্ষার দায়িত্ব, দ্বিতীয়টি হবে সম্পূর্ণ পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব এবং তৃতীয়টি বহন করবে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ ও সংস্কারের দায়িত্বভার। এঁরা নিজের নিজের দায়িত্ব পালন তো করবেনই—উপরন্তু এক ভাগের সঙ্গে অন্য ভাগের সহায়তা করবেন।

দরকার মনে হলে এই এপেক্স বোর্ড দুইটি স্তরে বিভক্ত হবে। একটি প্রাথমিক স্তরের, অন্যটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য।

পরীক্ষার জন্য এই স্তরগুলির কার্যপদ্ধতি কি হবে তা নিম্নে দেওয়া হল।

১) প্রশ্নকর্তা নির্বাচন (একই বিষয়ের জন্য অন্ততঃ দশজন প্রশ্নকর্তা থাকবে।

২) এই দশটি প্রশ্নপত্র থেকে সর্বশেষ প্রশ্ন বাছাই-এর জন্য একটি নির্বাচিত উপসমিতি। প্রশ্ন এমন হবে যে কোন বিষয়ের জ্ঞান সঠিক কিনা তা বুঝতে হলে প্রশ্নপত্র নিম্নলিখিত ভাবে সাজাতে হবে। ক) যুক্তিপূর্ণ উত্তরের সাপেক্ষে জ্ঞান নির্ণয়, খ) বিষয়ের এক পরিচ্ছেদের সঙ্গে অন্য পরিচ্ছেদের সংযোগ উপলব্ধির উপর পরীক্ষা।

গ) ছোট প্রশ্ন (objective)

৩) বর্ষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দৈনিক রোজনামায় পরীক্ষার দিন নির্ণয় করে দেওয়া।

৪) কোন অবস্থাতেই (গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভিন্ন) এই পরীক্ষার দিন বদলানো হবে না—এই ধারণা মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া।

৫) পরীক্ষা ঘরে যারা পরীক্ষার্থীদের উপর দৃষ্টি রাখবেন, তাঁদের নামের তালিকা তৈরী করা। কোন কেন্দ্রে থাকবেন তার খবর তাঁদের আগেই জানিয়ে দিতে হবে। এই কাজের জন্য তাঁদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে।

৬) পরীক্ষার পর উত্তরপত্র সংগ্রহ করা এবং কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের রোলনম্বর বা নাম মিলিয়ে হিসাব করে তা দুই বা ততোধিক পরিদর্শকের সামনে সীল করে – পরীক্ষা নিয়ামকের কেন্দ্রে পৌছে দিতে হবে এবং তার প্রাপ্তি রসিদ নিতে হবে।

৭) এই সমস্ত উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্য যথোপযুক্ত সংখ্যক বিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের এই ব্যাপারে স্বীকৃতি আছে এটা জেনে নিতে হবে। কোন অবস্থাতেই একজন পরীক্ষকের কাছে অধিক সংখ্যক খাতা পাঠানো উচিত হবে না—কারণ তাহলে ওঁরা ঠিক সময় দিয়ে প্রত্যেকটি খাতা পরীক্ষা করতে পারবেন না।

৮) যে সমস্ত পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে তাঁদের স্কুল থেকে ছুটি দিতে হবে এবং তাঁরা এপেক্স বোর্ড অফিসে বা আঞ্চলিক অফিসে বসে খাতা পরীক্ষা করবেন এবং সব কিছু ওখানেই তালা বন্ধ করে রেখে যাবেন।

৯) সমস্ত উত্তরের খাতা পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর—তিনপ্রস্থ মার্কসীট তৈরী করবেন এবং এর পরে সমস্ত খাতা সীল করে রাখবেন এবং সেই

অফিসেই জমা দিয়ে তার জমা দেবার রসিদ নেবেন। এই মার্কসীটের একটি কপি যাবে এপেক্স বোর্ড অফিসে, একটি আঞ্চলিক অফিসে এবং একটি নিজের কাছে রাখবেন।

এর পরে এপেক্স বোর্ড অফিসে বা আঞ্চলিক অফিসে সমস্ত মার্কসীট রোল নং মিলিয়ে তৈরী হবে এবং এইগুলি অন্ততপক্ষে একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা হবে এবং যদি কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে—তা হলে সীল করা খাতা খুলে তৎক্ষণাৎ তা বিচার করে দেখতে হবে। যেহেতু প্রত্যেক আঞ্চলিক অফিসে এই কাজ হবে সেই হেতু কাজের চাপ ভাগ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকেই এই বিচার করতে যথেষ্ট অবকাশ পাবেন।

মূল মার্কসীটটি যাবে পরীক্ষার্থীর জন্য স্কুলের কাছে। দ্বিতীয় কপিটি থাকবে অফিসে সার্টিফিকেট তৈরী করার জন্য। সার্টিফিকেট তৈরীর কাজও শুরু হবে অবিলম্বে এবং এই ব্যাপারে এপেক্স বোড দায়ী থাকবেন। দরকার মত তাঁরা আঞ্চলিক বোর্ড থেকে লোক নি.ত পারবেন এই কাজটির জন্য এবং এঁরা সার্টিফিকেটের কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার আঞ্চলিক অফিসে ফিরে যাবেন।

প্রশাসনের এই ভিত্তিটি সুদৃঢ় করলে আজকাল পরীক্ষার নম্বর নিয়ে বা খাতা পরীক্ষা নিয়ে যে দুর্নীতির কথা শুনতে পাই তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থীদের আস্থা ফিরে আসবে। এই ব্যবস্থায় অবিদ্যার আশ্রয় সত্যিকারের বিদ্যাস্থানে পরিণত হবে এবং অশ্রদ্ধার জায়গায় শ্রদ্ধা ফিরে আসবে।

মাধ্যমিক/স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল বের করবার তারিখ এমন হবে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কৃষি বা শিল্প কারিগরি বিদ্যালয়ে বা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষা বা ভর্তির সময় সীমার ভিতরে থাকে।

যে ব্যবস্থার কথা এখানে উল্লেখ করলাম এইগুলি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বা স্কুল বোর্ডের নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এর ব্যবহার প্রশাসনিক যোগ্যতার অভাবে লোপ পেয়েছে। এই প্রশাসনকে শক্তিশালী করে এই নিয়মগুলিকে ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে—তা হলে পরীক্ষা সংক্রান্ত গোলযোগ কমে আসবে এবং অনেক ক্ষেত্রে মিটে যাবে।

কোন সময় কোন অঞ্চলে যদি ছাত্র সংখ্যা একটি সীমার উর্ধ্বে চলে যায়—তখনই নতুন আঞ্চলিক বোর্ড খুলতে হবে এবং উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী বোর্ড গঠন এবং কার্যপদ্ধতি চালু করতে হবে।

পরীক্ষা ছাত্রদের মেধা নিরূপণের একটি পন্থা। ছাত্ররা এই মেধা প্রতিষ্ঠার

জন্য বৎসরের পর বৎসর অনেক পরিশ্রম করে এবং আশা করেন যে তাদের এই মেধার মান সুশৃংখল ও সুসংগঠিত উপায়ে নিরূপিত হবে। গত ১০ বৎসর ধরে যা চলে আসছে—তা শুধু ভরসাই নষ্ট করেনি - নষ্ট করেছে বিশ্বাস্যতা। যখন ছাত্ররা সমাজ শৃঙ্খলা, সম্ভ্রম ও সংস্কৃতির বাহক ও ধারকদের উপর ভরসা ও বিশ্বাস্যতা হারিয়ে ফেলেন সেখানে ভবিষ্যতেরই বা কি ভরসা? যা বলেছি এবং এখনও বলছি যে ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্য শিক্ষা প্রশাসন, পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতি পাঠ্যসূচী নির্ধারণের উপর সুসংঘটিত ও সুশৃঙ্খল গুরুত্ব আরোপ করা হোক। আর শিক্ষাকে সক্রিয় রাজনীতির আসর থেকে এবং সরাসরি সরকারী আওতা থেকে দূরে রাখা হোক।

শিক্ষা বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী, শিক্ষক, শিক্ষাবোর্ডের শাসকবৃন্দ—এঁদের প্রত্যেককেই একটা বিশেষ ম্যানেজমেণ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে এক সঙ্গে না পাঠিয়ে একটা সময়ানুগ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাগে ভাগে করতে হবে। কিন্তু উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত এই ম্যানেজমেণ্ট শিক্ষাক্রম প্রত্যেককেই নিতে হবে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এই ম্যানেজমেণ্ট শিক্ষাও অভিযোজন করে যাবে।

সময় চলছে - ইতিহাস তৈরী হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এই ইতিহাস কোথাও না কোথাও নথিভুক্তও হচ্ছে। কলঙ্কজনক কিছু যাতে আর লিপিবদ্ধ না হতে পারে—তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারলে—আজ থেকে ১০/১২ বৎসরের ভিতরে শিক্ষায় ভরসা ও বিশ্বাস্যতা ফিরে আসবে এবং আগামীকালের বংশধররা আমাদের দোষী সাব্যস্ত করবে না।

বাইরের জগৎ ও বিদ্যালয়

লেখক ভারতবর্ষের বাইরে ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাস্তরে শিক্ষা পরিচালনা ও শিক্ষাদান প্রথা লক্ষ্য করার সুযোগ অনেকবার পেয়েছেন।

এই সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যা আকর্ষণ করে তা হচ্ছে ছাত্রকে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে বিভিন্ন গঠনমূলক বাস্তবতার সঙ্গে এবং এই প্রচেষ্টার যারা কাণ্ডারী তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটানোর প্রচেষ্টা।

আমাদের স্কুলে বা কলেজে যাঁরা পড়ছেন - তারা শিক্ষান্তে জীবিকার তাগিদে বাইরে আসবেন। কিন্তু বাইরে তাঁরা যাবেন কোথায়? আমাদের ত সেরকম কোন পরিকল্পনাই নেই।

বাস্তবতার সঙ্গে আগে থাকতেই পরিচয় করানোর জন্য অন্যান্য দেশে, পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কাজকর্মের তালিকা থাকে। এই তালিকার অন্যতম হল - বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি জগতে সুপরিচিত বা এই সব শাখায় পণ্ডিত এমন সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়মিতভাবে স্কুলে বা কলেজে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় এবং এঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেশেন। আবার স্কুল, কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কলকারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এই যে আদান প্রদান চলে তার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায় এবং কোথায় কি ঘটছে তা জানতে পারে। ফলে ছাত্ররা স্বপ্নের জগতে বিচরণ না করে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে। এর ফল এই হয় যে ছাত্র-ছাত্রীদের যে সাধারণ জ্ঞান বাড়ে শুধু তাই নয়, এদের আত্মবিশ্বাস জাগায় এবং এরা জানতে পারে ভবিষ্যতে কোথায় এবং কিভাবে তারা জীবিকার সন্ধান পেতে পারে। এই রকম একটা ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় প্রিপারেটরী স্তরে প্রচলন করতে হবে।

পাশ্চাত্যদেশ সমূহে বিদ্যালয়ে ছুটার সময় ছুটী কাটানোর পরিকল্পনাও খুবই আনন্দদায়ক ও উদ্দেশ্যমূলক করে করা হয়। এই সময় খেলা, বনভোজন, নাটক ইত্যাদি করা ছাড়াও—গ্রামে গিয়ে চাষীদের ফসল তুলতে, চাষ করতে, কৃষির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে এদের সচেতন করে তোলা হয়। আমাদের দেশের শতকরা ৭৫ জনই গ্রাম এবং কৃষিভিত্তিক। বহু গ্রামে রাস্তা নেই। অনেক খাল, বিল সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। অনেক বিল কচুরী পানায় ভর্তি। যদি দ্বিতীয় প্রিপারেটরী স্তরের পর থেকে প্রতি বৎসর এই বিরাট যুবশক্তিকে গঠনমূলক এই সব কার্যের অঙ্গীভূত করে দেওয়া হয় এবং যথোপযুক্ত তদারকীতে এদের লাগানো যায় তবে এই দেশের উন্নতি রুখবে কে? অবশ্য এই কাজের জন্য একটা আঞ্চলিক পরিকল্পনা করতে হবে এবং তা করবেন এপেক্স বোর্ড, আঞ্চলিক বোর্ড, সরকারী শিক্ষা বিভাগ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এবং মেডিকেল বোর্ডের দপ্তর ও সহায়তায় কোন রাজনৈতিক দল এতে হাত দেবে না। যারা কাজ করবেন—তাঁদের পারিশ্রমিক থাকবে এবং এই কাজের জন্য তাঁরা স্কুল পরীক্ষায় নম্বর পাবেন এবং এই নম্বর বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে।

এইটুকু বলে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে এবং সমাজের কাছে এই প্রতিবেদন রাখতে চাই যে (১) প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচীর ভার কমান, (২) প্রথম ও

দ্বিতীয় প্রিপারেটরী স্তর তৈরী করুন, (৩) বাড়তি বিষয়গুলিকে বাৎসরিক শেষ পরীক্ষার আগেই পাক্ষিক বা মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে সরিয়ে দিন, (৪) ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা ও গুণ বিচারের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকারা রোজনামচা রাখতে শিখুন, (৫) উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার জন্য যোগ্য বেতন নির্দিষ্ট করুন। (৬) স্কুল ও কলেজ প্রশাসন চালাবার জন্য আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করুন, (৭) অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভিতর আরও ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপনের বন্দোবস্ত করুন—যাতে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা বাড়ে ৮) পরীক্ষা পরিচালনায় ও ফলাফল প্রকাশে বিশেষ নিয়মগুলি চালু করুন (৯) ছাত্র-ছাত্রীদের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় বৃদ্ধি করান যাতে তারা বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হতে পরে আর ভয় না পায়।

(১০) সরকারী শিল্প ও কৃষি পরিকল্পনা যাতে সফল হয় এবং এই পরিকল্পনার সামনে ছাত্রছাত্রীদের অবদান যাতে যাকে তার জন্য শক্তি যোগান।

বিনিয়োগ

গত পঁচিশ বছর ধরে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার স্তরে যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু এই বিস্তার না হয়েছে সুশৃংখলভাবে না হয়েছে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে। তদুপরি, রাজনৈতিক আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ও স্বার্থের সংঘাত। লোক সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ার এই সমস্ত জটিল পরিস্থিতির চাপে সাধারণ লোকের এদিকে নজর দেবার মত বা বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বোধ্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এরই ফাঁকে কিছু লোক ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা মেটাতে, নিজেদের চেষ্টায় কিছু কিছু স্কুল করেছিলেন কিন্তু যে প্রশাসন বা পরিচালন পদ্ধতি বা শিক্ষক নিয়োগের জ্ঞান থাকলে এগুলিকে গড়ে ফেলা যেত, - তা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে যেখানে স্কুল দানের উপর বা সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল সে সব ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্য রাজনীতিক বা রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ লোকদের সাহায্য নিতে গিয়ে স্কুলগুলি স্বার্থসিদ্ধির আগার এবং ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক দলাদলির শিকার হয়েছে। এগুলিরে সংস্কার করতে হবে। কিন্তু যে দেশে মাথাপিছু শিক্ষার খরচ ২ টাকা থেকে ৩ টাকা সেখানে এই সংস্কার সম্ভবপর নয়। এই টাকা দিয়ে হয়ত আজ থেকে ৩০।৩৫ বৎসর আগের ব্যবস্থা হ'ত—কিন্তু এখন তা আর হয় না।

যে পরিকল্পনার কথা বললাম এটি সফল করতে হলে বছরে ৫০০০ কোটি থেকে ৬০০০ কোটি টাকা লাগবে এবং এই হিসাবে আগামী ১০ বছরের জন্য এই বরাদ্দ রাখা হোক।

যেহেতু একই সঙ্গে সব কাজ সম্ভবপর হয়ে উঠবে না লেখকের মত এই যে কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক স্তরে এর কাজ শুরু হোক এবং ক্রমশ উচ্চতর স্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। তাহলে খরচ আয়ত্তের ভেতরে থাকবে এবং সুফল পেতে দেরী হবে না। সুফল স্থায়ী হবে কারণ সংস্কার ধারাবাহিক পরিবর্তনের সুযোগ নিতে পারবে।

কি করে এই টাকা লাগবে তার একটা খরচের হিসাব এই লেখার পেছনে জুড়ে দেওয়া হলো। যে সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এই খরচের হিসাব করা হয়েছে সে সংখ্যার ভিত্তি দেখান হয়েছে ১নং টেবিলে। আর একটি সংস্কার অতি অবশ্য এবং শীঘ্র প্রয়োজন আর সেটা হচ্ছে পাঠ্যসূচী কমান।

তৃতীয় যে সংস্কারটি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করতে পারা যায় সেটি হচ্ছে প্রিপারেটরী ক্লাসের প্রবর্তন। এতে খরচ অধিক হবে না কিন্তু ফল ভাল হবে। যে সমস্ত স্কুলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী থাকবে (কলেজেও থাকতে পারে) সেখানে গবেষণাগারের জন্য খরচ করতেই হবে। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব এই সব বিষয়েও গবেষণাগার দরকার। এর জন্য খরচ ধরতে হবে।

এই যে বৎসরিক খরচ দেখানো হলো তার শতকরা ৩৩ শতাংশ ব্যয় হবে কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাইমারী স্কুলের উন্নতিতে, ৩৩ শতাংশ যাবে মাধ্যমিক স্কুলে। এই খরচটা যদি এই স্তরে না হয় এবং খরচ করে যদি সফল হবার চেষ্টা না করা হয়—তবে পরের দিকে যত খরচই হউক না কেন—কোন সুফলই আসবে না—এটা ঠিক গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতই হবে।

[প্রবন্ধটি ১৯৭৩-৭৪ সালে লিখিত। সুতরাং অনিবার্য কারণেই পরিবেশিত পরিসংখ্যানের ভিত্তি '৭৩-'৭৪ পর্যন্ত। লেখকের আশু প্রকাশিতব্য ইংরেজী গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী সাগরিকা ভট্টাচার্য। ব্যক্তিগত জীবনে লেখক একজন ভারতবিখ্যাত বিজ্ঞানী। কিন্তু সাহিত্য শিল্পেরও একজন কাছের মানুষ। গ্রন্থ প্রকাশের আগেই প্রবন্ধটি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ—সম্পাদক]

BREAK-UP OF EXPENDITURE

KG & PRIMARY SCHOOL	430,000 Nos.	
Salary, 4 for KG 4 for Primary Teachers @ Rs. 330/- each teacher/month	8 × 300 × 430,000 × 12	Rs. 1240 crores
House & Medical Etc.		Rs. 400 ,,
Maintenance @ Rs. 200/- p.m.	20 × 012 × 430,000	Rs. 105 ,,
HIGH SCHOOLS	98,000 Nos.	
Salary 18 Teachers/School @ Rs. 700/- each teacher/month	18 × 700 × 8,000 × 12	Rs. 1500 ,,
House & Medical Etc.		Rs. 400 ,,
Main enance @ Rs. 800/-p.m.	800 × 12 × 98,000	Rs. 100 ,,
HIGHER SECONDARY & MULTI-PURPOSE SCHOOLS	43·000 Nos.	
Salary 10 Teachers @ Rs. 700/- each teacher/month	10 × 700 × 43,000 × 12	Rs. 365 ,,
House & Medical Etc.		Rs 100 ,,
Maintenance @ Rs. 800/p.m.	800 × 12 × 43,000	Rs. 42 ,,
		Rs. 3352 ,,
COLLEGE & UNIVERSITY SALARY, GRANTS, ETC.		Rs. 1100 ,,
		Rs. 5352 ,,

FACTS REGARDING EXPANSION OF EDUCATION

(ALL INDIA)

Particulars	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74
No. of the students in Class 1-5 (Lakhs)	192	252	350	505	632
6-11 year olds receiving education (%)	43	53	63	77	84
No. of students in Class 6-8 (Lakhs)	31	43	67	105	147
11-14 year olds receiving education (%)	13	17	23	31	36
No. of students in Class 9-11 (Lakhs)	12	19	29	50	75
14-17 year olds receiving education (%)	5	7	11	16	21
No. of University students (Lakhs)	4	6	9	15	32
17-23 year olds receiving education (%)	1	1	2	2	5
Science students in Universities (%)	38	33	27	30	50
No. of Primary Schools (including KG)	2,09,600	2,78,000	2,30,400	3,91,000	4,29,900
No. of High Schools	13,600	21,700	49,700	75,800	97,400
No. of Higher Secondary Schools	7,300	10,800	17,300	27,500	40,000
No. of Multi-Purpose Schools	—	255	2,100	2,400	2,600
No. of College (Arts, Sc. & Commerce)	540	770	1,120	1,800	3,300
No. of Universities	27	32	45	64	94
No. of Teachers : Primary Schools	5,38,000	6,91,200	7,41,500	9,44,400	11,68,400
Higher Secondary Schools	1,26,500	1,99,000	2,96,300	4,79,000	6,48,000
Universities & Colleges	18,650	27,900	41,800	66,900	99,600

কবিতাগুচ্ছ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যৌবনের শুরুতে, যখন মনের মধ্যে ফুঁসতে থাকে নানান্ বাসনা, যখন টগবগ করে আবেগ, সেই সময় কবিতা রচনা করতে গিয়ে নতুন কবিদের কবিতায় আর সবই অনেক বেশী পরিমাণে থাকে, শুধু সঠিক ভাষা ব্যবহারের অভাবটি স্পষ্ট বোঝা যায়। নতুন বংশীবাদক অদম্য উৎসাহে নানারকম বেসুরো আওয়াজ বার করে, যা অন্য সবাই বোঝে কিন্তু সে নিজে বোঝে না। তারপর কেউ কেউ, এক সময়, নিজস্ব সুরটি পেয়ে যায়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খুব অল্প বয়েসেই নিজস্ব ভাষা ও সুর খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি কোনো সময়েই একটি কোনো দলের একজন ছিলেন না, তিনি গোড়া থেকেই আলাদা।

কোনো কোনো কবির একেবারে স্বতন্ত্রভাবে বেরিয়ে আসা একটি বিশেষ ঘটনা। এরকম দেখা যায় না খুব বেশী। প্রথম দিকের রচনা থেকেই একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ :

…করোটি, হাড় পোড়া, ধুলো—
চাপ চাপ জমাট রক্ত। ছায়ামূর্তি কে দাঁড়িয়ে?
ধুলো, ধুলো। আমি ইয়াসিন,
পূরব চটির হাটে যাব; লাহেরীডাঙা ছাড়িয়ে
সে কত দূর। সেই এক ভাবনা ঘুরছে।
জল। জল! মরচে-পড়া চুল উড়ছে।…

এই অংশটি 'কাঁচা-রোদ্দুর, ছায়া অরণ্য' নামের কবিতা থেকে তোলা হলো। এটির রচনাকাল মাঘ, ১৩৫১। অর্থাৎ তখন এই কবির বয়েস কুড়ি, সেই সময়েই যে তিনিমরচে-পড়া চুলের মতন একটি নতুন ও অতি চাক্ষুষ উপমা দিতে পারছেন

তাই নয়, শব্দগুলির মধ্যে তিনি একটি অত্যন্ত গতিমান ছন্দকে চাপা দিয়ে রাখতে পেরেছেন, বক্তব্য হয়ে ওঠেনি প্রকট, শুধু 'ধুলো, ধুলো' এবং 'জল! জল!' এই রকম শব্দ ব্যবহারে এসেছে শব্দ-অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা। হ্যাঁ, কুড়ি বছর বয়েসে তিনি এরকম লিখেছিলেন। সে সময় জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখেরা পূর্ণবয়স্ক এবং পূর্ণ সৃষ্টিশীল। তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়, এবং কুড়ি বছর বয়েসে!

কবিতার দশক ভাগ অনুযায়ী যাঁদের আমরা চল্লিশের কবি বলি, তাঁদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, অরুণকুমার সরকার, মণীন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজন পরবর্তী কালে বিশিষ্ট হয়েছেন। এঁদেরও মধ্যে, সুভাষ ও নীরেন্দ্রনাথ—এই দু'জনই অতি অল্প বয়েস থেকে স্বেচ্ছামার্গী এবং নিজস্ব অস্ত্রে শক্তিধর। দু'জনের রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক এবং এতকাল পরেও দু'জনে দুই আলাদা সমুদ্রের বাতিস্তম্ভ হয়ে আছেন। এঁদের দু'জনের মধ্যেও আবার নীরেন্দ্রনাথ সব সময় সৃষ্টিশীল এবং কখনো আত্মতুষ্ট নন।

মহাভারতে অর্জুনের পরাক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর লঘুহস্ততা। এই বিশেষণ নীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও অত্যন্ত সপ্রযুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ কখন তূণীর থেকে বাণ নিচ্ছেন, কখন জ্যা-তে যোজনা করছেন তা কিছুই বোঝা যায় না, অথচ তিনি শান্ত হয়ে বসে থেকে হাজার হাজার শর বর্ষণ করতে পারেন। তীর ও ধনুকের মতনই শব্দ ও ছন্দের এই সমন্বয় খেলা। ছন্দ ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করতে করতে এই কবি শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছেন যে এখন আর এঁর কবিতায় আলাদা কোনো ছন্দের অস্তিত্বই নেই যেন, যা লিখেছেন, তা-ই ছন্দোময় হয়ে যাচ্ছে। বাংলা কবিতায় গদ্যভঙ্গি এখন সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয়ে যাবার পরও এখন আমরা বুঝতে পারি, ছন্দের একটা অমোঘ টান আছে। অন্য দিকগুলো বাদ দিলেও স্মরণযোগ্যতা এনে দেয় ছন্দই। আর স্মরণযোগ্যতা তো কবিতা উপভোগের একটা বিশেষ অঙ্গ।

অন্ত্যমিলকে অবশ্য এখন আর অতটা প্রয়োজনীয় মনে হয় না। ছন্দ ব্যবহার করলেও অন্ত্যমিল অনেকেই বর্জন করছেন আজকাল। কৌতুক ছলে বা একঘেয়েমী কাটাবার জন্য কেউ কেউ কখনো কখনো পংক্তির শেষে মিল দেন। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ এদিক থেকে ব্যতিক্রম। শুধু ছন্দ নয়, মিলেরও তিনি পক্ষপাতী, অনেক কবিতাতে, যেমন এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম দুটিতে। কিন্তু এই

মিলগুলি এমনই সাবলীল যে কোথায়ও একটুও থামতে হয় না। কোনক্রমেই প্রবহমানতায় বাধা ঘটায় না। তাঁর সমিল কবিতাও মুক্ত কবিতা।

প্রত্যেক কবিই তার নিজস্ব কবিতা লেখে। এবং কোনো কোনো কবি নিজেকেই নিজে বারবার ভাঙে এবং বদলায়। নীরেন্দ্রনাথ নিজেকে বারবার বদলে যাচ্ছেন, এগুলি তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট করা যায় না, প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই তো নয় নদীর এক একটি বাঁক, কিন্তু 'নীলনির্জন' থেকে 'উলঙ্গ রাজা'য় যে এই কবি অনেক বাঁক ঘুরে এসেছেন, তাও বোঝা যায় ঠিক। তিনি নিজেকে বদলাচ্ছেন নিজেকে আরও সহজ করার জন্য, অথবা বলা যায়, কবিতাকে আরও গভীর করার জন্য কবিতাকে ক্রমশই নিরাভরণ করে তুলছেন। যাঁর চিন্তা স্বচ্ছ, তাঁর রচনা কখনো দুর্বোধ্য হয় না। কষ্টকল্পনা এবং কৃত্রিম আড়ম্বরে বাংলা কবিতা অনেক সময় আড়ষ্ট ও ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। প্রকৃত কবিতা সোজাসুজি আমাদের ধাক্কা মারে। সে রকম কবিতা লেখা কত যে সহজ কাজ, তা বোঝা যায় এক একজন কবির জীবনব্যাপী সাধনা দেখলে। এই সাধনার কথা নীরেন্দ্রনাথ বলেছেন আজ থেকে কুড়ি একুশ বছর আগে লেখা একটি রচনায় :

আমি সকল সুখ মিথ্যে মানি,
তোমার সুখ পূর্ণ হোক, কবিতা।
আমি নিজের চোখ উপড়ে আনি,
তোমাকে দিই তোমার চোখ ফোটাতে।
তুমি তৃপ্ত হও, পূর্ণ হও
জ্বালো ভূলোক, জ্বালো দ্যুলোক, কবিতা।

আমাদের সৌভাগ্য, এই একজন প্রকৃত কবি বিন্দু বিন্দু রক্তের মতন তাঁর হৃদয় নির্যাস উপহার দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পাঁচটি কবিতা

সাজানো সংলাপ

আগে পারস্যের থেকে গালিচা আনাও,
তারপরে সাজাব আমি বাড়ি।…
নারী,
বৃথা কেন যন্ত্রণা বানাও?
তা ছাড়া মানচিত্রে আজও পারস্য নামের কোনো দেশ
আছে নাকি?…
যা নেই, প্রত্যেকে আমরা হাত বাড়িয়ে রাখি
তারই জন্যে। নির্নিমেষ
জেগে থাকি তারই প্রত্যাশায়।
এই যেমন ভালবাসা।…

সাজানো সংলাপ থেকে উঠে আসে অন্যবিধ ভাষা,
অতর্কিতে নাড়া দিয়ে যায়
বাড়িটাকে।
দুলে ওঠে ঘর-বারান্দা, কেঁপে ওঠে দরোজা-জানালা।

মুঠোর ভিতরে শুকনো মালা
নিয়ে আমি স্থির চোখে দেখতে থাকি তাকে।

দেখি, জানি, বলি

আমি কি দেখি না? আমি দেখি,
মন্দের শিয়রে জাগে ভাল।
কেন জাগে? বৃথাই জাগে কি
মেঘের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আলো?

আমি কি জানি না? আমি জানি
রাত্রি আসে, রাত্রি চলে যায়।

ঘাসে ও আকাশে কানাকানি
চলতে থাকে রোদ্দুরে হাওয়ায়।

আমি কি বলি না? আমি বলি,
অন্ধকারে দূরে আর কাছে
এখনও অজস্র কুন্দকলি
স্থির প্রতীক্ষায় জেগে আছে।

আজ সকালে

কালকে ছিল মেঘলা দিন, আজ সকালে রোদ্দুর উঠেছে।
গাছের পাতায়, পার্কে, ছাতে, বারান্দায়
স্বর্গের বাচ্চারা
খুব দৌড়াদৌড়ি করছে। এইরকম দিন
দেখা যায়
বছরে তিনবার মাত্র। এই বছরে ইতিপূর্বে যারা
দুইবার দেখেছে, তারা আগামী বছরে
কে কোথায় থাকবে, এই জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন
হয়ে আমি ফিরে আসি ঘরে।

জানালার সামনে আজও অগ্নিবর্ণ জিনিয়া ফুটেছে।

অযোগ্যতা

তুমি সব দিয়েছিলে।
আমি তার যৎসামান্য গ্রহণ করেছি।
তুমি জানো,
যেমন দেবার, তেমনি নেবারও যোগ্যত থাকা চাই।
আমার ছিল না।

মনে পড়ে

এখনো যে কিছুই লিখিনি,

এই কথাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়।
যে-লোকটা ফুটপাথে তার লক্ষ্মীছাড়া সংসার পেতেছে,
তাকে দেখলে মনে পড়ে।
নির্জন দুপুরে যে-বালক
ইঁদারার ধারে গিয়ে তার নিয়তির সঙ্গে খেলায় মেতেছে,
তাকে দেখলে মনে পড়ে।
ভাড়াটে বাড়ির ছাতে
মধ্যরাতে যে-মেয়েটি কালপুরুষের দিকে নির্বাক তাকায়,
তাকে দেখলে মনে পড়ে।

শিশুরা শ্মশানে যায়, কাঁচা হাতে দেওয়ালে-দেওয়ালে লিখে রাখে,
"তোমাকে ভুলব না।"
কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুলে যায়।
ভুলে গিয়ে বেঁচে যায়।
আমারও দু-একটা ভুলবার দরকার ছিল।
তবু কেন ভুলতে পারি না?

প্রবন্ধ

ব্রাহ্মণের গৃহগমন

গুণানন্দ ঠাকুর

দীর্ঘজীবন লাভের বহু যাতনা। শরীর অক্ষম হইয়া আসে। নানাবিধ রোগ কারণে শরীরমন্দির ব্যাধিমন্দিরে পরিণত হয়। মনুষ্যজন্ম লাভ করিলে এই অবশ্যম্ভাবী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকিতেই হয়। সুতরাং গুণানন্দ ইহাতে ভয় পায় না। গুণানন্দের গৃহচিকিৎসক নানারকম বিধান দিয়া থাকেন তাহাতে যাতনা কমে না। গুণানন্দ ইহাকে ভাগ্য বলিয়া ধরিয়া নিয়াছে।

তাহার অসুবিধা অন্যত্র। অধুনা সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে তাহার বুদ্ধিভ্রংশও শুরু হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরাণী বহুদিন পূর্বেই এ সত্যটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক বলিয়া গুণানন্দ কর্ণপাত করে নাই। এখন সন্দেহ হয় হয়তো বা ঠাকুরাণীর ধারণাই সত্য। গুণানন্দ আশা করে ঠাকুরাণী এ লেখা পড়িবেন না। নচেৎ তাঁহাকে সামলানো মুশকিল হইবে। রঙ্গরসিকতা থাকুক। কিছুদিন ধরিয়া গুণানন্দ লক্ষ্য করিতেছে দেশে জরুরী অবস্থার পূর্ণবিচার শুরু হইয়াছে। আতস কাঁচ সহযোগে সংবাদপত্রে শাহ কমিশনে যাহা বিবৃত হইতেছে তাহার বিবরণ পড়িয়া গুণানন্দ যখন বিভ্রান্ত এবং বিহ্বল, ক্ষুব্ধ এবং চরম লজ্জিত তখন সে সভয়ে আবিষ্কার করিয়াছে যে তাহার দেশবাসী শাহ কমিশনের সংবাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে। সে অবাক বিস্ময়ে শুনিতেছে তাহার প্রতিবেশীর প্রতিবেদন "রোজ রোজ আর ওই এক পাঁচালী ভাল্লাগে না"। কি বিস্ময়কর কথা! আজ যথায় প্রমাণিত হইতেছে যাঁহাদের হাতে রক্ষকের দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাঁহারা নির্লজ্জ ভক্ষকের ভূমিকা লইয়াছিলেন তখন শাস্তির দাবী নাই। ভবিষ্যতে কি করিয়া দেশকে অনুরূপ ডাইনীতন্ত্র হইতে রক্ষা

করা যায় তাহার সম্বন্ধে কোনোরূপ বিচার বিবেচনা নাই। শুধুমাত্র হিমালয় পরিমাণ অনীহা। গুণানন্দ বয়সভারে নুব্জ সুতরাং তাহারই ভুল হইয়াছে। তাই কহিতেছিলাম তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। নচেৎ সে স্বয়ং একই প্রকার অনীহাগ্রস্ত হইত।

কিন্তু সে তাহা হয় নাই। আজি চতুষ্পার্শ্বে অবলক্ষণ করিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল নিজকর্মে সর্বান্তঃকরণ মনযোগ প্রদর্শন। নচেৎ নিশ্চিন্তরূপে জানিয়া রাখুন—ডাইনী প্রত্যাবর্তন করিবেই। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের এক বৎসর হইয়া গিয়াছে। আমরা কি দেখিয়াছি। সর্বত্র শিথিলতা পুনর্বার ফিরিয়া আসিয়াছে। গুণানন্দ সংসার খরচা নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাঙ্কে গিয়া শুনিয়াছে—"কার্যবন্ধ দুই ঘণ্টা অতীত হইলে আসিবেন।" কলিকাতা শহরে গত এক বৎসরে পথিকের অবস্থা আরো খারাপ হইয়াছে। পথ চলিবার জন্য এখন প্রয়োজন পুষ্পক রথের। পদব্রজে যাওয়া অসম্ভব। পথ এখন পণ্য বিপণীকারের। ইহাই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের ফল। সরকারী কর্মচারী, জীবনবীমা কর্মচারী সকলেই সর্পের পঞ্চপদ দর্শন করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন সম্বন্ধে অনর্থক মসীব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা সমস্ত কলিকাতাকে ধাপার মাঠে পরিণত করিবার সাধু সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বহুলাংশে সফলতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের জয় হউক। রেল কোম্পানীর কর্মচারীরা, পরিবহণ কর্মচারীরা, বিমান সংস্থার কর্মচারীরা নির্দিষ্ট সময়সূচী রক্ষা করাকে দাসত্বের অপর নাম মনে করিয়া দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছে। জরুরী অবস্থায় লোকে নির্দিষ্ট সময়ে কর্মক্ষেত্রে যাইত। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পর তাহার প্রয়োজন নাই। যে কর্মের জন্য বেতন দেওয়া হয়, যে কর্ম করিব বলিয়া আমি চাকুরী গ্রহণ করিয়াছি, সেই কর্ম করাইবার জন্য মস্তকের উপর সর্বদা দণ্ড উঁচাইয়া রাখিতে হইবে, নহিলে আমরা বিদ্যালয়ের মর্কট ছাত্রের ন্যায় ব্যবহার করিব, ইহাই যদি প্রচলিত নীতি বলিয়া মানিয়া লই তবে ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে ইদি আমিন নাচিতেছে, অপিচ ব্যাঙ্ক কর্মচারীর ধারণা জরুরী অবস্থা বাঞ্ছনীয় কারণ সে সময় রেল সময়-সূচী মানিয়া চলিত। রেল কর্মচারী মনে করে জরুরী অবস্থা আদরণীয় কারণ তখন ডাকবিলি বড় সুন্দর হইত। ডাকঘরের কর্মচারী মনে করেন জরুরী অবস্থা শ্লাঘনীয় কারণ তখন জীবনবীমা তুলিতে গিয়া গাভাসকর এবং বিশ্বনাথের তুলনামূলক আলোচনা শুনিতে হইত না। জীবনবীমা কর্মচারী মনে করেন

জরুরী অবস্থাকালে বোনাস বন্ধ হইলেও স্ফীতোদর ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা টিট্ হইয়াছিল। গুণানন্দের দুঃখ বাংলার নাট্যদলগুলি উদ্ভট নাটকের সন্ধানে প্রতীচ্যের নাটকের স্মরণাপন্ন হন। গ্রামের যোগী ভিক্ষার ব্যাপারে উপেক্ষিত চিরকালই।

শুধুমাত্র বেতনভুক কর্মচারীদের দোষ দিয়া লাভ নাই। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি এবং রাজনৈতিক নেতারাও গড্ডলিকা স্রোতের বাহিরে যান নাই। কোনোরূপ চেষ্টাও নাই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর পূর্বসূরীর ন্যায়ই সামরিক বিমানে যাতায়াত করেন। ইন্দিরা মন্ত্রীসভায় বাঙালী মন্ত্রীদের কলিকাতা ভ্রমণের সময় যেরূপ চেলাপরিবৃত দেখা যাইত দেশাই মন্ত্রীসভার বাঙালী মন্ত্রীরও তদ্রূপ অধ্যাপক ফেউ দেখা গিয়াছে। বক্তৃতার স্রোত বন্ধ হয় নাই। আমাদের দেশ বিশাল, বিশালতর তাহার সমস্যাবলী। গুণানন্দ এরূপ গণ্ডমূর্খ নহে যে সে আশা করিবে রাত্রিপ্রভাতে সমস্ত সমস্যাবলীর আশানুরূপ সমাধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোথাও কোনো চেষ্টার সূত্রপাতও থাকিবে না ইহা কি প্রকার অবস্থা? রাজ্যমন্ত্রিসভা এখনো বিরোধীদলের ভূমিকাই পালন করিয়া চলিয়াছে। কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্ক সমস্যাই যেন আসল সমস্যা। কর্মহীনের কর্মসংস্থান শিল্পোন্নয়ন কোনো সমস্যাই নহে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধিগ্রহণ করার ব্যক্ত কারণ এবং সত্য কারণে ব্যবধান বিরাট। পূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ধরনের নৈরাজ্য উপস্থিত হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু পরেও তো উন্নতির লক্ষণ দেখিতেছি না! অধিগ্রহণে সমস্যা কমে নাই। বরং বাড়িতেছে। ইন্দিরা গান্ধীর পরিণতি কি কাহাকেও কোনো শিক্ষা দেয় নাই। ইন্দিরার পদলেহন করা যাহাদের বৃত্তি ছিল তাহারা আজ অস্তিত্বরক্ষার জন্য গণতন্ত্রের ভেক ধরিয়াছে। আশা করিতেছে অশিক্ষিত দেশবাসী মূর্খও বটে। তাহারা ভেক দেখিয়া বিগলিত হইয়া যাইবে। ইন্দিরা গান্ধী সদর্পে ভ্রমণ করিতেছেন। কোনো অনুশোচনা নেই কোনো প্রায়শ্চিত্ত নাই। ক্ষমতার গদীর পিছনে উদ্বাহু হইয়া দৌড়াইতেছেন। দেশে কিষাণ দিবস হইতেছে, প্রকাশ্য সম্মেলন হইতেছে। পূর্বের মতোই সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। বাষ্পীয় শকট, ভারবাহী মোটর যানে বিনাশুল্কে লোক নগর দর্শনে আসিতেছে। দেশের নেতারা ভাবিতেছেন আমাদের পিছনে কি অসাধারণ গণসমর্থন। আরেক মূঢ় নারীও একই কর্ম করিয়া নিজের মিথ্যার জালে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে কেহই শিক্ষালাভ করে নাই। ইতিহাসের বোধহয় উহাই বিধান।

গুণানন্দ তাহার জীবদ্দশায় অনেক দেখিয়াছে। বিদেশী শাসন, স্বদেশী শাসন, হরিৎ শাসন, লোহিত শাসন সবই দেখিয়াছে। শাসক শ্রেণী বদলাইতে দেখে নাই শুধুমাত্র কুশীলবের পরিবর্তন দেখিয়াছে। যে জনগণের দুঃখে সকলেই বিচলিত যে কোনো ব্যাপারে তাহাদের দাবী সবচেয়ে অবহেলিত হইতে দেখিয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে তাহার বিশ্বাস ছিল বিদেশী শাসন উৎপাটিত হইলে দেশে শান্তি ফিরিবে সাম্য আনিবার চেষ্টা হইবে। আজ সে বিশ্বাস তাহার নাই। তাই সে বুঝিয়াছে দীর্ঘজীবন সত্যই যাতনাময়।

বাণিজ্যচিন্তা

উৎপাদনশীলতা ও মানবিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সামনের সারির তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা

রণজিৎ গুহ

বর্তমান সময়ে সমগ্র দেশের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল স্থবিরতা (Stagnation) এবং মুদ্রাস্ফীতির অদ্ভুত মিশ্রণ যা কিনা "Stagflation" নামে পরিচিত, তাকে অতিক্রম করা। শুধুমাত্র টিকে থাকার তাগিদেই, আমাদের দেশ আজ এত বিভিন্ন মাত্রার অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি। এই সব কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাটি হ'ল গতি। আমাদের উপকরণের ভাণ্ডার সীমিত এবং সামান্য সঞ্চয় থেকে সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে যা অবশ্য প্রয়োজন তা হ'ল বর্ধিত উৎপাদনশীলতা এবং উপস্থিত সঞ্চয় ভাণ্ডারের সর্বোত্তম ব্যবহার। বর্ধিত উৎপাদনশীলতা মানে আসলে চেষ্টা ও ফলাফলের অনুপাত কমানো, কেবল উৎপাদন বাড়ানো নয়। দক্ষতা ও রীতি-কৌশলের (Technique) ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সঠিক প্রবণতার অনুশীলন না ক'রে রীতি-কৌশলের ব্যবহার যেন অনাবাদী জমিতে উচ্চফলনক্ষম বীজ ছুঁড়ে ফেলার মত।

বর্তমান প্রসঙ্গে উৎপাদনশীলতা তা হলে প্রাথমিক ভাবে প্রবণতা সংক্রান্ত একটি বিষয় যা আবার মানবিক সম্পর্কের পটভূমিকা ছাড়া বিচার করা যায় না। মানবিক সম্পর্ক অবশ্য শিল্পের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যাপার নয়, কেননা যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই কোন না কোন ধরনের সম্পর্ক থাকবে। সে সম্পর্ক সহযোগিতামূলক বা সুসমঞ্জস কিংবা উদাসীন অথবা হিংস্র, যে কোন রকমের হতে পারে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের সম্পর্ক ব্যক্তি বিশেষ অনুযায়ী এক এক ধরনের চেহারা নেয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তি বা দলের মধ্যেকার

ঘাত-প্রতিঘাতও এই সব সম্পর্ককে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা করে।

শিল্পের ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য একটা শান্তিপূর্ণ সমঝোতার আবহাওয়া গড়ে তোলা, যেখানে সম্পর্কিত সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে তাঁদের সংস্থার কাজকে সুসম্পন্ন করতে।

ফলে, সমস্ত পরিচালক গোষ্ঠীরই (Management) দায়িত্ব হ'ল একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করা এবং সেই লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য গ্রহণযোগ্য উপায় ও পদ্ধতি বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখা। এখানে উপায় ও পদ্ধতি বলতে সঠিক নীতিগ্রহণ সুনির্দিষ্ট কর্মধারা এবং দায়িত্ব বণ্টন এবং অন্য সবরকম পরিচালনা-কৌশলকেই বোঝানো হচ্ছে।

উচ্চতম পরিচালকমণ্ডলী যে সব নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা কতটা পরিমাণে নীচের দিকে পৌছবে সেটা ট্রেনিং এবং কম্যুনিকেশনের ব্যাপার। আবার এই সমস্ত ট্রেনিং এবং কম্যুনিকেশন প্রার্থিত ফলাফল অর্জন করবে কিনা, তা নির্ভর করে একটি সংস্থার ভিতরকার প্রত্যেকটি অংশের যেখানেই ব্যক্তিসংসর্গ ঘটছে সেখানকার উপস্থিত মানবিক সম্পর্কের উপর।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রতিটি ব্যক্তি মানুষকেই নানারকম ভূমিকায় দেখা যায়—সন্তানের কাছে সে স্নেহময় পিতা, স্ত্রীর কাছে দরদী স্বামী, বাবা মার কাছে সন্তান, আবার আত্মীয় বন্ধুর কাছে বন্ধু। তেমনি একটি সংস্থাতেও একজন মানুষকে মুখ্যত তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে হয় অর্থাৎ অধস্তনের কাছে উর্ধতন, উর্ধতনের কাছে অধস্তন এবং সহকর্মীর কাছে বন্ধুর ভূমিকা পালন। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্ভ্রম এবং বিবেচনার ভিত্তিতে যে সমঝোতার সৃষ্টি হয়। পারিবারিক জীবনের আনন্দ-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তার প্রয়োজনই সর্বাধিক। এই একই নীতি একটি সংস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেখানে মানবিক সম্পর্ককে শক্ত জমির উপর দাঁড় করাতে গেলে প্রধান প্রয়োজন সমস্ত স্তরের মধ্যে একটি উৎপাদনক্ষম সম্পর্কের ক্ষেত্র (arena of productive relationship) বিস্তার করা।

কোন সংস্থার বিভিন্ন স্তরে সুসমঞ্জস সম্পর্ক থাকবে কিনা তা নির্ভর করে তার টপ ম্যানেজমেন্টের দক্ষতার উপর। অর্থাৎ কীভাবে তাঁরা নিচের স্তর অবধি যোগাযোগ করতে পারেন এবং তাদেরও উর্ধ্বমুখী যোগাযোগে সাহস দিতে

পারেন এবং কতটা সুবিবেচনার সঙ্গে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন ঊর্ধ্ব স্তরের নির্দিষ্ট করা নীতি ও পদ্ধতি ব্যাপারে নীচেরতলার কোন রকম অবদানের প্রচেষ্টাকে।

একজন কর্মচারী যে রকম ব্যবহার পান তার সঙ্গে উৎপাদনশীলতার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। কোন কর্মচারী যখন অনুভব করে যে তার ওপরওয়ালা তাকে কেবল একটি যন্ত্রাংশ বা শুধুমাত্র বিভাগের আর একটি মাথা হিসেবে গোনে তখন স্বভাবতই সে স্বল্প উৎপাদনক্ষম হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে, যদি সে অনুভব করে যে তার ওপরওয়ালা প্রকৃতই তার বিষয়ে, তার ভালোমন্দ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহী, তা হলে সে তার সেরা কাজ দেখানোর চেষ্টা করে। এ বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে আর্থিক উন্নতিসাধনই বর্ধিত উৎপাদনশীলতার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় ওষুধ, কিন্তু সেই সঙ্গে এও আজ প্রমাণিত যে এটি একমেবাদ্বিতীয়ম কথা নয়। আর্থিক সুবিচার ছাড়াও কোন কোন বিশেষ অবস্থায় আজকের কর্মীর প্রয়োজন মানসিক উৎসাহের। উৎপাদনশীলতা প্রসঙ্গে একজন তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকার প্রশ্নটি বিবেচনা করবার আগে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের পরিধিটি স্থির করে নিতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত বছরের পর বছর ধরে এই ধরনের ভূমিকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন যন্ত্র ও পদ্ধতির কারিগরি উন্নতি, স্পেশালাইজেশন এবং লাইন ফাংশন থেকে স্টাফ ফাংশনের দিকে ঝোঁকার সাথে সাথে কাজের পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা-রক্ষা, পুরস্কার বা শাস্তি দান এই সব বিষয়ে একজন তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা এখন সম্পূর্ণ খর্ব। এখন সব সময়ই তার সরাসরি উপরওয়ালা ছাড়াও এমন কেউ না কেউ থাকেন যিনি কোন না কোন তত্ত্বাবধায়কের কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশী জানেন। দৃশ্যত একজন তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অর্পিত থাকে এমন কাজে যার উপরে তার সত্যিকার কোন কর্তৃত্ব নেই। বদ্‌লি বা উন্নতি, মজুরী নির্ধারণ অথবা যন্ত্রপাতি কি পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে এখন আর তার কোন হাতই নেই। সে নিজেকে এখন কম গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলত কম কার্যকরী ব'লে মনে করে। ম্যানেজমেণ্ট অবশ্য সামনের সারির তত্ত্বাবধায়কদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বোঝাতে গিয়ে অনেক গালভরা নাম দিয়েছেন যেমন "eyes and ears of Management" "first line of defence;" "Key man in Production," "Every Supervisor is his own Personnel manager' ইত্যাদি। কিন্তু কার্যত তার সরাসরি উপরওয়ালা ছাড়াও অসংখ্য উপদেষ্টার সামনে তার নিরর্থক উপস্থিতি তাকে কেবলমাত্র একজন মধ্যস্থ বা যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি

ক্ষীণসূত্র হিসেবেই পর্যবসিত করে। সেই সূত্রটিও আবার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোলযোগের সামনে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

সেকালে বৃহত্তর উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতার জন্য যৌথ আলোচনার উপর জোর দেওয়া হয়, নাগালের ভেতরকার সব রকম সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার এবং শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের কথা নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করা হয় সেকালেও, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার দূরে যাক, সামনের সারির তত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে আলোচনায় বসাটাই একটা অদ্ভুত বিরল ঘটনা।

এতৎসত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে এই শ্রেণীটি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে কর্মীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম, তাকে কাজের মধ্যেই শ্রমিকদের সঙ্গে বাস করতে হয় এবং সেই কাজকে উপযুক্ত ক'রে তুলতে হয়। এ কারণে প্রত্যেকের মনেই বর্তমানে যেটা প্রথমে আসা প্রয়োজন তা হ'ল পরিচালক মণ্ডলীর ভিতরে আমাদের প্রথম সারির তত্ত্বাবধায়কদের পুনর্বাসন করা। পরিকল্পনা এবং কর্মসূচীর ব্যাপারে তাকে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে গঠনমূলক স্তরে কাজ করতে। তার ভেতরে জাগিয়ে তুলতে হবে সেই বোধ যাতে সে নিজেকে ম্যানেজমেণ্টেরই একজন ব'লে মনে করতে পারে।

'সুপারভাইজারি ট্রেনিং' এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উপর জোর দেওয়াও প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়কদের কর্তব্যের এমন অনেক দিক আছে যার জন্য ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে। বৃহত্তর উৎপাদনশীলতা অর্জন করতে আজকে যার প্রধান প্রয়োজন সেই সুস্থ মানবিক সম্পর্ক স্থাপনে একজন তত্ত্বাবধায়কের সাথে যথার্থ অবদান রাখতে পারে তার জন্য দরকার তার অধস্তনদের দৃষ্টিতে তার মর্যাদার যোগ্য পরিচয় দেওয়া। চূড়ান্ত বিচারে তাই দেখা যায় যে সামনের সারির তত্ত্বাবধায়করাই পারে তার অধীন কর্মচারীদের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে, উপকরণগুলির শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহারে তাদের সহযোগিতা পেতে এবং ফলত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে। যেহেতু তার পরিচালনাধীন কর্মী গোষ্ঠীর কাজের পরিমাণ নির্ধারিত হয় তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভূতি, কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বদানের ক্ষমতার ভিত্তিতে সে কারণেই তাকে আবার বসাতে হবে তার আসল জায়গায় যাতে সে তার ভূমিকা যথাসাধ্য ভালোভাবে ক'রে উঠতে পারে। আজ যদি সে তার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে অসমর্থ হয় তা হলে তা হবে আমাদেরই ব্যর্থতা কেননা যা বহুদিন আগে করা উচিত ছিল তা আমরা করতে পারিনি। ক্যাসিয়াস্-এর প্রস্বরে বলতে ইচ্ছা হয় "The fault is not in our stars but in our Selves".

শিল্পভাবনা

শিশিরকুমার

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম থেকেই কবি-সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিভাবান, শিশির-কুমার কিন্তু তেমনি প্রথম থেকেই অভিনেতা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, যদিচ পাকাপাকিভাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী অভিনেতা হিসেবে তাঁকে দেখার আগেও তাঁর অভিনয়খ্যাতি কিছু লোকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শিশিরকুমার অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে উত্তীর্ণ ত্রিশে অভিনয়কে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন।

শিশিরকুমারকে রঙ্গমঞ্চে আমি প্রথম দেখি ১৯৩৬ সনে। তখন আমি প্রথম বার্ষিক কলা বিভাগের ছাত্র। থাকি রামমোহন ছাত্রাবাসে। শিশিরকুমারের নাম অবশ্য তার আগে থেকেই জানি। আমার কাকা ও মেজদা থিয়েটার দেখতে ভালবাসতেন। সেই সুবাদে শিশিরকুমারের অভিনয় খ্যাতির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। তাছাড়া তখনকার পত্র-পত্রিকা মারফৎ তাঁর খবর পেতাম। আমার নিজের ধারণা, যে কোনো কারণেই হোক, শিশিরকুমারের খ্যাতি নিয়ে মাতামাতি তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের পর থেকে স্তিমিত হতে থাকে এবং তাঁর আর্থিক সাফল্যও কমতে থাকে। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত দুর্গাদাস ও অহীন্দ্র চৌধুরী রঙ্গমঞ্চে ও রূপালি পর্দায় যে রকম পাবলিসিটি পেতেন শিশিরকুমার তা পেতেন না। ঐ সময়ে মাঝে মাঝেই তিনি স্বাস্থ্যের কারণে কলকাতার বাইরে যেতেন। মোটের উপর সিনেমা-পত্রিকাগুলোতে শিশিরকুমার খুব সামান্যই স্থান পেতেন এবং স্টেজের উপর তাঁর unpradictable হাবভাব নিয়ে কিছুটা বিরূপ সমালোচনাই হতো। ১৯৩২ সনে আমি পর্দায় প্রথম দেখি শিশিরকুমারকে 'সীতা'য় রামের ভূমিকায়।

তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে তখন থেকেই আমার উৎসাহ ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই কিরণবাবু যেমন ভাল অভিনয় করতে পারতেন, তেমনি অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও ছিল প্রচুর। তিনি শিশিরকুমারের এ অভিনয় দেখে খুব উচ্ছ্বসিত হন নি। বললেন যে রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার রামের ভূমিকায় যে অপূর্ব কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ করেছেন, তা পর্দায় পারেন নি। এখানে তাঁর কণ্ঠস্বর সেই হিসেবে অনেকটা নিচুমানের। তাছাড়া শিশিরকুমারের একটি দৃশ্যে সংজ্ঞা হারানোর ভঙ্গীও তাঁর ভাল লাগেনি। আমি তখনো রঙ্গমঞ্চে রামের ভূমিকায় শিশিরকুমারকে দেখিনি। অশ্বত্থামার মতো পিটুলি গোলা জলই আমার কাছে অমৃতবৎ। শিশিরকুমারের হাবভাব, চালচলন, কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণভঙ্গী আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলল।

বলাবাহুল্য নিউ থিয়েটার্সের হাতীমার্কা বই হলেও শিশিরকুমারের 'সীতা' দর্শক নিল না। চণ্ডীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি দুর্গাদাস-অভিনীত ছবির তুলনায় সীতা, যাকে বলে একেবারেই ফ্লপ করল। কিন্তু কেন এমন হলো? আমার পরবর্তীকালে মনে হয়েছে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতার ভাষায় লেখা নাটক রঙ্গমঞ্চে সফল হলেও সিনেমায় তা অস্বাভাবিক বলে দর্শকদের মনে হয়েছিল। তাছাড়া সিনেমা শিল্পকে শিশিরকুমার ঠিক আধুনিক শিল্পকলার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে নারাজ ছিলেন। তিনি মনে করতেন সিনেমায়ও একই প্রকরণের অভিনয় চলা উচিত। সিনেমায় যতোগুলি বই তিনি অভিনয় করেছেন প্রত্যেকটির সমালোচনায় বেশির ভাগ পত্র-পত্রিকা তাঁর অভিনয়কে মরুদ্যান বলেছে। সিনেমায় তাঁর অসাফল্যের এটি একটি বড়ো কারণ।

কলকাতায় এসে শিশিরকুমারকে দেখলাম বিজয়া নাটকে রাসবিহারীর চরিত্রে নয় নরেনের চরিত্রে। তাঁকে একেবারেই মানায় নি। ১৯৩৬ সনে তাঁর বয়স ৪৭ কি ৪৮। কিন্তু তখনই তার দেহ স্থূল হয়েছে, মাথায় চুল নেই বললেই চলে। প্রথম দৃশ্যে যেখানে তিনি পূর্ণ গাঙ্গুলীর ভাগনে হিসেবে বিজয়ার কাছে দরবার করতে এসেছেন, সে দৃশ্যে সংলাপ শোনাই গেল না। তাছাড়া বিজয়াবেশী কঙ্কাবতীও সমান বে-মানান। তাঁর মতো শিল্পীও কী করে এ ধরনের গতানুগতিকতায় গা-ভাসিয়ে দিতেন তা বোঝা মুশকিল। অভিনয় অবশ্য খুবই সুন্দর। একটি দৃশ্যে যেখানে নরেন দেখাচ্ছে কী ক'রে সে বন্ধ জানলাটা খুলল তা দুটো আঙুলের সাহায্যে শিশিরকুমার সুন্দরভাবে দেখালেন। সেই ১৯৩৬ এও দেখলাম রঙ্গমঞ্চে ভিড় জমে নি। বহু আসন খালি। তখন শিশিরকুমার নবনাট্য মন্দির এই নামে স্টারে

অভিনয় করতেন। শিশিরকুমারের জনপ্রিয়তা যে কমেছে তা এই দিনের দর্শক সমাগম দেখেই বুঝতে পারলাম।

এরপরই শিশিরকুমারেয় অভিনয় দেখলাম রীতিমত নাটকে প্রফেসার দিগম্বরের ভূমিকায়। সে দিনের ইতিহাস আরো বেশি স্মরণীয় এই কারণে যে সেদিন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসেছিলেন সেই অভিনয় দেখতে। সেদিনও নবনাট্য মন্দিরের বহু আসন খালি ছিল। দিগম্বরের অভিনয়ে শিশিরকুমারের জুড়ি ছিল না। তাঁর ভাঙা আসর জমাতে রীতিমত নাটক যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ থেকে বহু উদ্ধৃতি আছে। একটি উদ্ধৃতি হলো "এই করেছ ভালো, নিঠুর, এই করেছ ভালো" ইত্যাদি। শিশিরকুমার এই দিন অভিনয় করতে করতে যেখানে আছে "আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে, আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো", সেখানটায় এসে বারবার হোঁচট খেতে লাগলেন। ধূপ আর দীপে গোলমাল হতে লাগল। দু-তিনবার চেষ্টা করেও যখন ভুল সংশোধন করতে পারলেন না, তখন শিশিরকুমার সাবলীলভাবে আবৃত্তি করলেন সমভাবের আর একটি কবিতা "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে" ইত্যাদি। শুনে চমৎকৃত হলাম।

প্রফেসর দিগম্বরের ভূমিকায় শিশিরকুমারকে যেমন মানাত, অভিনয়ও করতেন তেমনি অপূর্ব। নাটক হিসেবে রীতিমত নাটক নিচুস্তরের। বুদ্ধদেব বসু ও প্রমথ বিশী এই নাটকটির কড়া সমালোচনা করেছেন। কিন্তু অভিনয়ের গুণে এই ধরনের নিকৃষ্ট নাটকও দারুণ জমতো।

অভিনয় শেষে রবীন্দ্রনাথ যখন মোটরে চাপলেন তখন শিশিরকুমার হাতজোড় করে মোটরের সামনে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের প্রশংসা করে বললেন যে নাটকটি কিছুটা boring। শিশিরকুমার বারবার কবিকে অনুরোধ জানালেন তাঁর "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দেবার জন্য। এই বইটি অভিনয় করার খুব ইচ্ছা ছিল শিশিরকুমারের। এই উপন্যাসটির যে নাট্য সম্ভাবনা, তার এক সিকিও নেই "রমা" কিংবা "বিজয়া"য়। রবীন্দ্রনাথের মোটর চলে যাওয়ার পর শিশিরকুমার তাঁর সঙ্গীদের বললেন যে কী লজ্জার কথা, কবির কবিতা তাঁর সামনেই তিনি ভুলে গেলেন! রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক দেখতে আসায় তিনি খুব খুশী। বললেন যে লাটসাহেব এলেও তিনি এত খুশী হতেন না।

এই সময় পর্দায় রীতিমত নাটকের সিনেমা ভার্সন "টকী অব টকীজ" দেখে আমার খুবই ভাল লাগে। শিশিরকুমার সে বছর সিনেমায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার

সম্মান পান। কিন্তু তাঁর অভিনয় যে মঞ্চঘেঁষা এ কথাও পত্রপত্রিকা বলতে কসুর করল না।

বলতে ভুলে গিয়েছি, ১৯৩২ এ 'সীতা' সিনেমায় দেখার কিছু পরে শিশির-কুমারের আবৃত্তি শুনলাম রেকর্ডে। রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা "রাত্রে ও প্রভাতে" ও "আশা"।

স্পষ্ট উচ্চারণ, অর্থবোধক ও কাটা কাটা। অপূর্ব কণ্ঠস্বর। সুর আছে, তবে তা কানে লাগে না। শুধু খটকা লাগল যখন শিশিরকুমার বললেন 'নব অরুণ সিন্দূর রেখা'। স্পষ্টতঃই ছন্দ পতন হলো, কারণ মাত্রাবৃত্তছন্দে লেখা এই কবিতাটি মূলতঃ ৬ মাত্রার। সুতরাং অরুণ সিঁদুর হবে "সিন্দূর" হবে না। রবীন্দ্রনাথও "সিন্দূর" লেখেন নি। নাটকীয় আবৃত্তিতে ধরা পড়ল না, কিন্তু কবিতাপাঠে এ ত্রুটি শিশিরকুমারের কাছ থেকে আমরা আশা করি না।

১৯৩৮ এ নবনাট্যমন্দিরে শিশিরকুমারের দুটি বই আলমগীর ও শেষরক্ষা একই রাত্রে দেখলাম। আলমগীর শিশিরকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়। কিন্তু সে রাত্রে খুব সাধারণভাবেই অভিনয় করলেন। দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলেন না। তবে শেষরক্ষায় চন্দরদার অভিনয় হলো সাবলীল ও সপ্রতিভ। বিশেষ করে যখন বললেন 'চন্দ্রে গেরোন লেগেছে'—তা এখনও কানে বাজছে।

শিশিরকুমার অভিনীত আরো দুটি ছায়াচিত্র হলো চাণক্য ও পোষ্যপুত্র। চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত নাটক অবলম্বনে চিত্রায়িত। আর 'পোষ্যপুত্র' অনুরূপা দেবীর ঐ নামের উপন্যাসের চিত্ররূপ। শিশিরকুমার অভিনীত মঞ্চের চাণক্য আমি দেখিনি। মঞ্চে শ্যামাকান্তের ভূমিকায়ও শিশিরকুমারের অভিনয় আমি দেখিনি। চিত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলাম। মঞ্চসফল নাটকের চিত্ররূপ সাধারণতঃ উৎরোয় না। কারণ মঞ্চে অভিনয় একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সিনেমায় এ সীমাবদ্ধতা নেই। সেইজন্য মঞ্চের অভিনয় একটু চড়াপর্দার, সিনেমায় অভিনয় সেই অনুপাতে স্বাভাবিক। শিশিরকুমার মঞ্চকে বেশি ভালবাসতেন। সিনেমা সম্বন্ধে তাঁর একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। সিনেমার ভিতর দিয়ে শিল্পের ধ্রুপদী রূপ ফোটানো যায় না, এই ছিল তাঁর ধারণা। সেইজন্য সিনেমার চিত্ররূপে তিনি নাটকীয়ত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এবং অভিনয়ও হতো তাঁর চড়াপর্দায়। সিনেমায় তিনি যে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি তার কারণ তাঁর এই অনড় মনোভাব।

১৯৪৮ সনে 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে দেখলাম সীতা। বলা বাহুল্য রামের ভূমিকায় শিশিরকুমার। তখন শিশিরকুমারের বয়স ৬০। তাঁর যৌবনের অভিনীত রাম দেখিনি। ছায়াচিত্রের সীতায় তিনি রামের ভূমিকায় যখন অভিনয় করলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশের কিছু উপরে। রামের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে আমার মনে পড়ত উদয়শংকরের কথা। শিশিরকুমারের অভিনয় ছিল নৃত্য-সৌষ্ঠবযুক্ত, আর উদয়শংকরের নৃত্য ছিল অভিনয় সমৃদ্ধ। মঞ্চে তাঁদের ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ চলাফেরায় কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল ছিল। বৃদ্ধ শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর তখনও উদাত্ত, কিন্তু মিষ্ট নয়। সব চাইতে ভাল লাগল সেই দৃশ্যটি যেখানে শিশিরকুমার "ওরে ও কার কণ্ঠস্বর" বলতে বলতে ছুটে আসতেন। অপূর্ব অভিনয়। শিশিরকুমারের অভিনীত রাম একক ও অনন্য।

এরপর আরো কয়েকটি অভিনয় দেখেছি নাট্যাচার্যের। বিশেষ করে মনে পড়ছে সম্মিলিত অভিনয়, মিনার্ভা স্টেজে, প্রফুল্ল। গিরিশচন্দ্রের এই নাটকটি কতবার যে অভিনীত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যোগেশের পার্টে গিরিশচন্দ্র ও দানীবাবু দুজনেই প্রথিতযশা। ছায়াছবির প্রফুল্লর এ ভূমিকায় নেমেছেন তিনকড়িবাবু। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য ও প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ এই দুটি ভূমিকায় কে ভাল অভিনয় করতেন শিশিরকুমার না দানীবাবু—এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যাঁরা এঁদের দু'জনেরই অভিনয় দেখেছেন তাঁদের মধ্যে মতৈক্য নেই। অভিনয়ে যাকে super imposition বা আরোপ বলা হয়, অনেকের মতে, এ বিষয়ে দানীবাবু ছিলেন শ্রেষ্ঠ। শিশিরবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে। নাট্যরসিকদের মতে যোগেশের ভূমিকায় দানীবাবু ও শিশিরকুমারের চেয়ে বেশি সার্থক ছিলেন গিরিশচন্দ্র। বিশেষ করে "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" এই কথা কটি বলার সময় তিনি যে প্রস্তরীভূত বেদনায় পরিণত হতেন তার তুলনা নেই।

আর একটি সম্মিলিত অভিনয় শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে সাজাহান। শিশিরকুমার ঔরঙ্গজীবের ভূমিকায় ও অহীন্দ্র চৌধুরী সাজাহানের ভূমিকায়। শিশির বাবু আরম্ভ করলেন দাপটের সঙ্গে, স্টেজকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে, কিন্তু আস্তে আস্তে মিইয়ে যেতে লাগলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান উৎকর্ষের সঙ্গে অভিনয় করে গেলেন। বহু জায়গা বাদ দেওয়া হয়েছে, তবু সাজাহানের দীপ্তি কিছু কমলো না। দু'একটি বই-এ দেখি অহীন্দ্র চৌধুরীকে নস্যাৎ করার জন্য নানাধরনের কুযুক্তির অবতারণা করা হয়। শিশিরকুমারের ভক্ত হয়েও বলছি

যে শেষের দিকেও অহীন্দ্রবাবু অভিনয়ে যে পারদর্শিতা দেখাতেন, শিশিরকুমার তা পারতেন না। সম্মিলিত অভিনয়ে বারবার তিনি নিজেকে দর্শকের সামনে খেলো করেছেন। অপ্রকৃতিস্থ আচরণে শিশিরকুমার বহু অভিনয় পণ্ড করেছেন, পার্ট ভুল বলেছেন এবং অনাবশ্যক রূঢ় আচরণ করেছেন। দুর্গাদাসও কোনো কোনো অভিনয়ে অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরী কখনই দর্শকদের হতাশ করেন নি। অহীন্দ্র বাবুর শিল্পী হিসেবে মূলধন শিশিরকুমার ও দুর্গাদাসের চাইতে কম ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি সযত্নে সে মূলধন বাঁচিয়ে চলেছেন ও তা বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। আর শিশিরকুমার বে-হিসেবীর মতো নিজের ক্ষমতাকে কত নীচে নামিয়ে এনেছেন। দুর্গাদাসও কতকটা সেই দোষে দোষী। প্রকৃতি অসংযমকে ক্ষমা করে না।

এই সময়ে আর একটি সম্মিলিত অভিনয় দেখার সৌভাগ্য ও সুযোগ হয়েছিল। এটি বিজয়া। শিশিরকুমার অভিনয় করলেন রাসবিহারীর ভূমিকায়। এ ভূমিকায় তাঁকে মানিয়েছিল এবং তিনি অভিনয়ও করেছিলেন সাবলীল ভঙ্গিতে। ঐতিহাসিক নাটকে শিশিরকুমার আবৃত্তিমূলক চড়াপর্দার অভিনয় করতেন। কিন্তু সামাজিক নাটকে তাঁর অভিনয় হতো স্বাভাবিক।

শিশিরকুমারকে শেষবারের মতো দেখি মঞ্চে নয়, কৃষ্ণনগরে একটি সাহিত্য সম্মেলনে এবং তার পরদিন কৃষ্ণনগরে তাঁর আত্মীয়গৃহে। এটি ১৯৫৮ সন। তার কয়েক মাস পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। সাহিত্য-সভায় তাঁর ভাষণ আমাদের তৃপ্ত করতে পারেনি। প্রথমতঃ তিনি বিদেশী অভিমতের উপর যে আস্থা রাখা যায় না সে কথা ফলাও করে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় কী রকম বিরূপ সমালোচনার মধ্য পড়েছিলেন সেটি সবিস্তারে বললেন। স্পষ্টতঃই বোঝা গেল আমেরিকায় তাঁর নিজের অসাফল্যের এটি একটি সাফাই। রুচির দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয়, তথ্যের দিক থেকেও নয়। সেই সভায় সকলের অনুরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'আশা' কবিতাটি কেটে কেটে আবৃত্তি করলেন। সকলেই মুগ্ধ হলো। সমগ্র কবিতাটি যেন তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হলো।

পরদিন তাঁর সঙ্গে স্বল্পক্ষণের আলাপ হয়েছিল। শিশিরকুমার নানা কারণে তখন অপ্রসন্নচিত্ত। কথোপকথনে তার আভাস পাচ্ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে বললেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর কিছু অভিমান আছে। কী প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছু ভাঙলেন না। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি গ্রন্থে শিশিরকুমারের জবানিতে বলা হয়েছে যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মনে করেন, বিশেষ

করে অভিনয়ের সময়ে হাত দুটোর ব্যবহারে। শিশিরকুমারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি হেমেন্দ্রকুমারের বক্তব্য অস্বীকার করলেন। বরং বললেন যে অবনীন্দ্রনাথের অভিনয়ই তাঁর বেশি ভাল লাগত। "শিশির সান্নিধ্যে" শীর্ষক একটি গ্রন্থেও দেখেছি শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু'একটা উলটো পালটা কথা বলেছেন ও শিশির ভক্তদের একজনের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অতি প্রগল্‌ভ উক্তির প্রতিবাদ না করে প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন। শেষ জীবনের অসাফল্যে শিশির-কুমারের মানসিক স্থৈর্য বোধহয় কিছুটা ভারসাম্য হারিয়েছিল। অকারণে তিনি যশস্বী কৃতীদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে নিজেকে ছোটোই করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের "শ্রীবৎস চিন্তা" নাটকের উচ্চ প্রশংসা করলেন। পরবর্তীকালে নাটকটি পড়ে তাঁর প্রশংসার কারণ খুঁজে পাইনি। থিয়েটারে সিন পালটানোর বিরুদ্ধে বললেন। বস্তুতঃ এটি রবীন্দ্রনাথের অভিমত। তাঁকে যখন সবিনয়ে বললাম যে যে কারণে অভিনেতা অভিনেত্রীরা চরিত্র-উপযোগী পোশাক পরেন ও রূপসজ্জা করেন ঠিক সেই কারণেই, অর্থাৎ বিষয়টি বাস্তবানুগ করার জন্যই সিনের প্রয়োজন, কারণ সিনগুলো হচ্ছে স্থানিক রূপসজ্জা ও ফ্রেম, তিনি সে যুক্তি খণ্ডন করতে চাইলেন না।

শিশিরকুমারের অভিনয়, ভাষণ ও প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে আমার মনে হয়েছে তিনি নিজেই এক অসম ট্রাজেডির নায়ক। জীবনে বিধুরতা আসে ভাগ্যের পরিহাসে কিংবা স্বীয় চরিত্রের অসংলগ্নতা বা বিসংলগ্নতার জন্য। মানুষ যেখানে ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক সেখানে তার সব প্রচেষ্টা বার বার খণ্ডিত হয়ে প্রতিনিয়ত তার অসহায়তাকে নির্মমভাবে প্রকট করে। আর মানুষ যেখানে নিজের চরিত্রের কোনো ত্রুটির জন্য নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করে ও অক্ষুণ্ণ রাখতে অক্ষম, সেখানে তার জীবনের সুধাপাত্রের ছিদ্র দিয়ে অমৃত ক্রমশঃই নিঃশেষিত হতে থাকে। শিশিরকুমার মূলতঃ এই দ্বিতীয় ট্রাজেডির নায়ক। ভাগ্যের বিড়ম্বনাও একেবারে ছিল না তা নয়। তবে তা গৌণ।

শিশিরকুমারের শিল্পীজনোচিত আত্মবিশ্বাস ছিল, কিন্তু বিনয় ছিল না। সব সময়েই তিনি নিজেকে সকলের চাইতে বড়ো বলে মনে করতেন। তিনি বিদগ্ধ ছিলেন সত্য, কিন্তু বৈদগ্ধ্য তাঁকে স্নিগ্ধতা না দিয়ে প্রখরতা দিয়েছিল। তাঁর মধ্যে যে পরিমাণে দীপ্তি ছিল সে পরিমাণে মাধুর্য ছিল না। তিনি নিজে যা অপরের কাছ থেকে প্রাপ্য বলে মনে করতেন অপরকে ঠিক সেইমতো তার প্রাপ্য দিতে পারতেন না। অহংকৃত আত্মসম্মান বোধের সঙ্গে সহানুভূতি বা সহমর্মিতা যুক্ত

হয়নি। ফলে তিনি ভক্তের প্রশংসা পেয়েছেন, কিন্তু বহুজনের সহৃদয় সাহায্য পান নি। আর আত্মবিশ্বাস অহংকারের সঙ্গে সমীকৃত হওয়ায় নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি শুধু নির্মম ভাবে উদাসীনই ছিলেন না, সে-গুলোকেই সযত্নে লালিত করেছেন। বহুবার বহুভাবে তিনি জীবনের বিধাতৃপুরুষের কাছ থেকে ইংগিত পেয়েছেন। হয়তো শ্মশান নৈরাশ্যে কখনও কখনও স্থিতধী হয়েছেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

শিশিরকুমারের জীবনের সুর কেটে যায় প্রথমা স্ত্রীর শোচনীয় আত্মহননের ফলে। এর ফলে তাঁর মগ্নচৈতন্যে একটা অপরাধ বোধ নিশ্চয়ই ছিল। শিল্পের ভিতর দিয়ে তিনি তার উত্তরণ চাইতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রখরতাও এইজন্য। তাঁর অতিরিক্ত পানাসক্তিও নিজেকে ভুলে থাকার জন্য। এর ফলে তাঁর জীবন ও অভিনয় স্বভাবকে ক্ষণে ক্ষণে অতিক্রম করেছে। তাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট কিন্তু কিছুটা অস্বাভাবিক। কণ্ঠস্বর উত্তেজিত ও প্রমত্ত। বাচনগুলি থিয়েটারী ঢঙের।

শিশিরকুমারের চরিত্রে যে বিরোধাভাস ছিল তা তাঁকে যেমন উঁচুতে তুলে ধরেছে তেমনি তাঁকে নীচেও নামিয়েছে। আসলে তিনি ছিলেন রেনাশাঁসের ফসল, তাই সব কিছুতেই অসমপ্রান্তিক। কিন্তু জীবন তো শুধু অসমপন্থায় চলে না। জীবনের একটি ধ্রুপদী সমতা আছে। সেখানে ক্ষণে ক্ষণে গানের সমের মতো ফিরে আসতে হয়। যে আসতে পারে না, সে ট্রাজেডিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। শিশিরকুমার পদ্মভূষণ খেতাব গ্রহণ না করে যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন, দেউলিয়া হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে উত্তমর্ণদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার মধ্যে সে তেজস্বিতার পরিচয় না দিয়ে নিজের হাতে গড়া ব্যর্থতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতা তারই সাজে, বিদ্যাসাগরের স্থৈর্য, দৃঢ়তা ও চরিত্র যার আছে।

স্বরচিত ব্যর্থতার শিকার শিশিরকুমার নিঃশব্দে এ পৃথিবী থেকে প্রস্থান করলেন ১৯৫৯ সনে। তার বহুপূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে শ্রীভ্রষ্ট জীবনরঙ্গমঞ্চে। তাঁর ট্রাজেডি পরিণতিতে না-পৌঁছানোর নয়, এ ট্রাজেডি পরিণতিকে ধরে রাখতে না পারার, পরিণতিকে পরিণত করতে না-পারার। এ বিষয়ে তিনি তাঁরই অভিনীত মাইকেলের সগোত্র।

ব্যক্তিগত রচনা

সাদা ও সিধে

কবিতা সিংহ

কয়েক বছর আগে একটি নাট্যদল আমার একটি নাটক মঞ্চস্থ করে।

জনৈক পঞ্চাশের গদ্যলেখক সেটি দেখে এতই মুগ্ধ হন যে ওই দলের পরিচালককে ডেকে বলেন যে,—'আমি তোমাদের টিকিটের দাম দিতে চাই। কারণ যে নাটক আমাকে মুগ্ধ করে আমি তা টিকিট কেটে দেখি।' এর কিছুদিন পরে ওই পরিচালককেই ঐ লেখক বলেন,—ওই সব থার্ডক্লাশ নাটক ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারো না? পয়সা খরচ করে স্টেজ্ করো?

সেই তরুণ যুবকটি কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে কেবল প্রশ্ন করেছিলেন—'দাদা, আপনার কোন্ কথাটি সত্যি? সেদিনের না আজকের?'

যাঁরা পঞ্চাশের এই গদ্যলেখককে গত পঁচিশ বছর ধরে চেনেন, তাঁরা কিন্তু এমন প্রশ্ন কখনই করেন না। কারণ তাঁরা জানেন ইনি যখন যা বলেন তা সত্যও না মিথ্যাও না, কিন্তু সদা সর্বদা অতি চমকিত গদ্য।

আমার ব্যক্তিগত আচরণ বিধিতে বিরক্তিকর কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিমল নির্দেশ নেই। কিন্তু ক্ষতিকর মানুষ সম্বন্ধে আছে।

ক্ষতিকর বলতে ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা নাইবা তুললাম। কিংবা জাগতিক ক্ষতি। সবচেয়ে বড় ক্ষতি বোধহয় যেখানে বিশ্বাস প্রবঞ্চিত হয়, মর্যাদা অবমানিত হয়, মৃত্যু অসম্মানিত হয়, বন্ধুতা হস্তারক হয়।

মানুষের কোথাও না কোথাও কিছু সত্য, কিছু প্রকৃত স্থির বিন্দু তো থাকা দরকারই। পিতৃদত্ত নাম সকলেরই কিছু আহামরি নয়। বিমল, সুনীল, শক্তি, মিহির, সত্যেন, শংকর, শ্যামল, মতি, এসব তো গণ্ডায় গণ্ডায় বাংলাদেশে

মেলে। তা বলে তো কেউ পিতৃদত্ত নাপছন্দ নামকে এলিয়াস করেননি। আবার সম্পূর্ণ সত্যের চেয়ে যেমন অর্ধসত্য হানিকর, সম্পূর্ণ মিথ্যার চেয়ে যেমন অর্ধমিথ্যা ঘৃণার্হ, ইনিও তেমনি পছন্দসই ব্রাহ্মণ-পদবীটি, কিন্তু অবিকৃত রেখে দিয়েছেন।

ধরে নেওয়া যাক এঁর নাম পশুপতি বাবু, সংক্ষেপে পশুবাবু, আমার জানতে কৌতূহল হয় যদি এঁর পদবী 'বেরা' 'ঢ্যাং' 'সেতুয়া' মায় 'মাল' হতো, তাহলে ইনি কোন পদবী এলিয়াস নিতেন?

এহেন পশুপতিবাবু বহুদিন ধরেই অত্যন্ত প্রগতিপন্থী। বাইশ তেইশ বছর আগেকার কথা বলছি। তখন বিমল রায়চৌধুরী নামক একজন গল্প লেখকের পিছনে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকতাম। তাঁর কাছে অনেকে গল্প-টল্প চাইত। আমাকে কেউই চিনত না। তেমনি একসময়ে এক পত্রিকার সম্পাদক কফি-হাউসে তাঁর কাছে এবং পশুবাবুর কাছে গল্প চাইলেন। পশুবাবু পাশের টেবিলে সেই লোকটিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৎপরোনাস্তি নীচু গলায় বললেন,—কোনো ওল্ড স্টাইলের লেখকের সঙ্গে আমি গল্প লিখি না।

নীচুগলায় বলা হলেও কথাটা বিমল রায়চৌধুরীর কানে গিয়েছিল। তিনি হেসেছিলেন মাত্র। এবং ওই পত্রিকায় গল্প দেননি।

কিন্তু আমি হাসতে পারিনি।

পশুবাবুর প্রগতিপন্থী লেখার প্রথম নিদর্শন 'কার যেন রক্ত মাংস।' অবশ্যই প্রগতিপন্থী। কারণ শরৎচন্দ্রের দেবদাসের পর বাংলা সাহিত্যের খুব কম হীরোই দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বেশ্যালয়ে গিয়েছে।

'নিছক প্রদর্শনী' নামে একটি 'অত্যন্ত প্রগ্রেসিভ আউটলুক' এর উপন্যাস লিখেছিলেন পশুবাবু। তাঁর একদশকেরও বেশি আগে, অমনি 'প্রগ্রেসিভ আউটলুক' নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন তাঁরই সমকালীন অনেক লেখক। একটি নাম তো এক্ষুনি মনে পড়ছে - শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (অনিলের পুতুল) অনেকেই হয়ত ঐ প্রগ্রেসিভ্ আউটলুকের বিষয়বস্তুটা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠছেন তাই জানাই,—তাহ'ল 'বৌ এর গর্ভজাত।'

এসট্যাবলিশমেনট্ এর দুই বাড়ি থেকেই তো তিনি দুটি উপন্যাস প্রসব করেছেন। কিন্তু সে দুটি কেবলি প্রকাশিতই হ'ল 'আত্মপ্রকাশ' করল না। কেবল মুক্ত অঙ্গন নয় 'শো' তো রবীন্দ্র সদনেও তো খোলা হ'ল। পাবলিক তবু কেন যে তাঁর আর্টকে গ্রহণ করতে পারল না কে জানে? সাহিত্যমগ্ন পশুপতি বাবু

সাহিত্যের প্রতি এতই সৎ যে শোকে দুঃখে মৃত্যুতেও তিনি সবার আগে বিচার করেন—মৃত জন সাহিত্যক্ষেত্রে কতটা পারঙ্গম ছিলেন।

১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন শংকর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে যখন তাঁর প্রিয় বন্ধুরা বজ্রাহত তখন শংকরের বাজে কবিতা, শংকরের কুন্তীলকবৃত্তি নিয়ে তাঁর সময়োচিত সারগর্ভ বিশ্লেষণী আলোচনায় শংকরের অনেক বন্ধুই মর্মাহত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর থেকেই পশুবাবুকে আমার খুবই সার্থকনামা বলে মনে হতে থাকে।

তালিকা বৃদ্ধি করতে চাইনে,—কেবল দুটি ঘটনার উল্লেখ করব।

১৯৭০-৭১ এর কোনো সময় আমার স্বামীর একটা মেজর অপারেশন হয়। সে সময় তিনি দীর্ঘকাল মেডিকেল কলেজে ছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে, নতুন উপন্যাসের বিজ্ঞাপন কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকায় পৌছোতে যাবার পথে পশুপতি বাবু মেডিকেল কলেজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

তিনি নানাবিধ কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। যেমন 'একসিস টনসিয়ালিজম্', 'এলিয়ানেশন' প্রভৃতি প্রভৃতি। এবং প্রসংগত যথারীতি কাফ্‌কা কামুও আসছিল। কিছুক্ষণ এসব কথা শোনার পর তিতি বিরক্ত হয়ে বিমল বললেন,—নতুন কিছু বল্ ওসব তো দীর্ঘকাল ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে, শুয়ারের মাংস হয়ে গেছে।

পশুবাবু তখন কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—আরো নতুন ইজম্ এসে গেছে নাকি?

বিমল তখন রবপ্রিয়ের স্ট্রাক্‌চারালিজম্ এর কথা তুললেন।

বিমুগ্ধ পশুবাবু বিমলকে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে বললে বিমল হাওড়া ব্রিজ, নাট বলট্, ইত্যাকার উপমা দিয়ে দিয়ে শব্দের স্ট্রাকচার তৈরী করার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন।

দু'সপ্তাহ পরে নতুন সাপ্তাহিকটি পেয়ে বিমল হেসেই অস্থির। তাতে একটি বিজ্ঞাপন দেখা গেল—"বাংলা সাহিত্যের নতুন স্ট্রাকচারালিস্ট উপন্যাস—'পশুপতি বাবুর নিছক প্রদর্শনী'"—এবং বক্ষ্যমাণ কপিতে হাওড়া ব্রিজের ওই সব উপমাদি হাজির। কৌতূহলী পাঠক ওই সময়কার সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটি সচক্ষে দেখে নেবেন।

দ্বিতীয় কাহিনীটি আমার শোনা।

কফি-হাউসের তরুণতমদের একটি দল আমাদের আলোচ্য বাবুর জ্ঞান দান শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন এবার পশুপতি বাবুকে কিছু জ্ঞান দিতে হবে। তাঁরা পশুবাবুর কাছে এক গ্রীক দার্শনিকের নাম করেন। পশুবাবু তাঁর নাম কখনো শোনেন নি। শোনা যাচ্ছে পশুবাবু সেই গ্রীক দার্শনিককে আজও খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁর নাম 'নেপন্দীস্'।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ এই দার্শনিকের দর্শন ও ঠিকানা পশুবাবুকে দয়া করে পৌছে দেবেন।

পশুপতি বাবুকে আর একটি কথা জানানো দরকার, একটি প্রাচীন প্রবচন আছে,

কিছু লোককে সব সময় বোকা বানানো
সম্ভব
সব লোককে কিছু সময়ের জন্যও বোকা বানানো
সম্ভব
কিন্তু সব লোককে সব সময়ের জন্য
বোকা বানানো সম্ভব নয়।

পশুবাবু? আপনি এই প্রবচনটি বোধহয় জানেন না। তাই না?

কবিতাগুচ্ছ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

সুরজিৎ ঘোষ

কবিতার ক্ষেত্রে যুগ সৃষ্টি বা যুগ বদল সময় অনির্ভর। কখনো একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী আসেন, কখন কেউ কেউ একাই এসে প্রচলিত সব কিছু ওলট পালট করে দেন। নির্মাণ করেন নতুন শৈলী। ফলে এই বদল কোন বিশেষ সময় সীমার উপর নির্ভর করে না, যে দশ অথবা বিশ বছর বাদে বাদেই তা হবে। তবে এই সব প্রতিভা সম্ভব হন বিশেষ কোন সামাজিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতেই। ফলে কবি সেই বাস্তবতার অভিমুখীন বা বিরোধী যাই হন না কেন, সেই অবস্থারই কোন একটা প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধিত্বমূলক কবি হিসাবে তাঁকে দেখতে হয়। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা, যুদ্ধ, দেশবিভাগ, যন্ত্র সভ্যতা এবং গ্রাম শহরের মেলবন্ধন সাম্প্রতিকের কবিতার উপর বিভিন্ন ঢল বইয়ে দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে যে ক'টি চরিত্রকে আলাদা করে চেনা যায় তার একটি নিজেদের আবেগ অনুভূতি, দুঃখ কষ্ট, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা চীৎকার ক'রে বলতে ভালবাসেন। এঁদের অন্যতম পুরোধা শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আবেগকে তিনি এড়িয়ে চলেন না, বরং তার মধ্যেই বসবাস করেন। ব্যক্তিগত নির্জনতাকে মন্দিরের পবিত্রে সমাহিত না রেখে তিনি তাকে সরল শিশুর মত খুলে ধরেন হাটের মাঝখানে।

কিন্তু কেন? কেন এই চীৎকৃত আবেগ? এর মূল খুঁজতে গিয়েও দেখা যায় এ সেই আজকের ইতিহাস এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি চৈতন্যের সামাজিক আবহাওয়ার অভিঘাত। গ্রামের সহজ উদাসীন বালক পারিবারিক ও সামাজিক ধাক্কায় একদিন শহরে এসে পড়ে। আমলকিতলা, মেন্দি ঝোপ আর সোঁদা মাটির পৃথিবী থেকে একটানে ঘোড়ার গুয়ের গন্ধের ভেতরে বিশাল কলকাতায়।

চলাফেরা মেলামেশায় ক্রমে তৈরী করে একটা শহুরে সামাজিকতার সম্পর্ক। তারপর একদিন বিভ্রান্তিকর রাজনীতির স্বপ্নভঙ্গের ভিতর দিয়ে আবিষ্কার করে এই যন্ত্র-শাসিত সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তি মানুষের প্রতি কত উদাসীন। তখন আর তাকে কোন সুস্থ বিশ্বাসের মধ্যে ধরে রাখা যায় না। সে ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। আর সেই উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতরে শহুরে নির্মোক সরিয়ে আস্তে আস্তে 'ছোটবেলার ইস্টিশান, দোলমঞ্চ, গাঁয়ের চাষাভূষোর সঙ্গে গাছপালা, পানাপুকুর'—পরিপ্রেক্ষিত সুদ্ধ এক পাড়া-গাঁ তার মধ্যে চেপে বসে। তার পরিত্রাণ থাকে না। এই বিশাল সামাজিকতার ভেতরে যখন সে ধীরে ধীরে নির্জন হয়ে যায়, তখন তার নিজের কথা শোনার মত মানুষ থাকে না। সমস্ত স্মৃতি, আত্মপীড়ন, যন্ত্রণা এবং সুখ তাই সে কেবল কবিতারই কাছে সমর্পণ করে আর তখন তার আযৌবন ভানের চেষ্টা খসে পড়ে।

"কবিতাকে গ্রাম্য ক্লেদ, পচা পিছুটান থেকে যতো
তুখোড় শহরে আনি, ব্যথা পায়, সবজির মতন
লুপ্ত হ'তে থাকে আর ক্লোরফিল বিশুদ্ধ প্রতীকে
অনূদিত হ'তে থাকে ; অমন আলেখ্য তার অপ্সরার
কিম্ভূত বিস্ময় হয় দেবতার, তারই হাতছানি
পারি না এড়াতে, শুধু কাছে যাই, কাছে যেতে থাকি।"
(পারি না এড়াতে, শুধু কাছে যাই :
ঈশ্বর থাকেন জলে)

সামাজিক পরিবেশ নির্ভর মানসতার ভিতরে এইভাবে ব্যক্তি চেতনার একটি গোপন পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সময় ও নিজস্ব জীবন কখন কখন তাঁর কবিতায় ব্যক্তিজড়িত অসংখ্য অনুভব, পরিবেশের উচ্ছ্বাস ও হতাশার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছে, আবার কখন এই সব কিছু দূরে সরিয়ে মগ্ন বিক্ষোভে মুখ গুঁজড়ে পড়েছে।

মূলত কিন্তু সর্বত্রই গভীর অনাত্মীয়তার বোধ কাজ করে তাঁর, কখন তীব্র ঘৃণায় :

মানুষের সঙ্গে আর মেলামেশা সঙ্গতও নয়—
মনে হয়, এর চেয়ে কুকুরের শ্লেষ্মাও মধুর॥
(ভুল থেকে গেছে :)

আবার কখন জীবনের অর্থশূন্যতা সূক্ষ্ম বিন্যাসে ধরা পড়ে :

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার
আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।
(জরাসন্ধ : হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য)

আসলে চোখের আড়ালে বুকের ছায়ায় সহস্র কথার ভিতরে যে অসহায় নির্জন শূন্যতাবোধ তারই কাব্যময় অথচ সোচ্চার প্রকাশ শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এ।

তাঁর আগের যুগের বা সমসাময়িক অনেক কবির মধ্যেই যে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় বা কাব্যধারণা ও মূল্যবোধ ছিল, প্রথম থেকেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এ তা অনুপস্থিত বরং তিনি অনেক বেশী নির্ভর করেছিলেন অভিযানমুখী অভিজ্ঞতার অনুভবের উপরে। তাঁর জীবন যাপনের এই অভিযানমুখীনতা অনেক অপরিচিত যন্ত্রণার প্রশ্নে বা অনির্দিষ্ট সঙ্গহীনতায় বারবার এনে ফেলেছে তাঁকে।

যেমন :

যার করতল নেই সে কাকে ভিক্ষে দেবে ?
যার করতল নেই সে বুকে হাত বুলোবে ?
যন্ত্রণা কি চালের কাঁকর ? ফুটবলে ফাঁক ? হাঁটুর ব্যথা ?
যন্ত্রণা কি ভালোমানুষ সবার হাতেই তালি বাজাবে ?
(কিসের জন্যে :)

অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিধি ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানসের আত্মপীড়ন স্পৃহা তাঁকে কোন সহজ পরিত্রাণ দেয়নি, বরং ক্রমেই নিয়ে গেছে জটিল ও বিস্মিত বিপদসংকুল স্তরে। এই ক্রমান্বয় টানাপোড়েনে তাঁর ভালোবাসাও মাঝে মাঝে বেঁকে গিয়েছে :

সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম
আস্তে, যেমন জামরুলে, ঐ নীল ভিজোনো গাছের ছালে
(বিষ পিঁপড়ে :)

আবার এর বিপরীত শান্ত উচ্চারণও তাঁর কবিতায় প্রচুর।

আসলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় এত আত্মক্ষয়ী উপস্থিত যে তা তাঁর কবিতাকে কোন নির্দিষ্ট দর্শনে পৌঁছতে দেয়নি; পক্ষান্তরে গল্পের আভাসে আমাদের নিয়ে গেছে বারবার কোন অপরিচিত বা অধ পরিচিত ছায়াচ্ছন্নতায় :

অমন ভুরুর তল হে বালিকালতা
কে বিরহজলে সাজিয়েছে চন্দন ?
(যদি ঝরে যাও কে নেবে তোমায় আর
: হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য)

বা 'ব্যবধান' কিংবা 'আড়াল' কবিতার অনুষঙ্গের পীড়া যা ভেতরের কোন পুরনো গল্পকে বার বারই জাগিয়ে দিয়ে যায়।

অনুষঙ্গের নির্মাণে সচেতন শিল্পীমনস্কতা অপরিহার্য। আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জর্জরিত নিঃসঙ্গতা আমাদের বুঝতে দেয় না এই গোপন পরিকল্পনা। কবিতাকে তিনি পদ্যর বেশী গুরুত্ব দিয়ে দেখাতে চান না বাহ্যত, কখনো একটি বা দু'টি আশ্চর্য পংক্তির মোহে অকারণ অমিত কথনে চলে যান, কবিতার বই সাজানোর ক্ষেত্রেও কোন কালানুক্রমিকতা বা ভাব সাদৃশ্য রাখেন না। এ ছাড়া অপর্যাপ্ত প্রগল্‌ভতাও তাঁর কবিতাকে প্রায়ই শিল্পমান থেকে বিচ্যুত করেছে। তবু এর পাশাপাশি তিনি 'ছিন্ন বিচ্ছিন্ন'র মত বই লিখেছেন যেখানে স্বাভাবিকভাবে আসা কবিতাকে ভর দেওয়ার জন্য বানানো পংক্তি খুঁজতে হয়নি। অথচ এই স্বাভাবিকতা যা তাঁর কবিতাকে অনেকের কবিতার চাইতে পৌঁছে দিয়েছে বহু উপরে, তাই আবার সঠিক সংযমের অভাবে চাপল্য ও কোলাহলে মিশেও গেছে বারবার।

তবে কি তিনি কেবল স্বভাব কবি ? না, এ সিদ্ধান্তও যথাযথ হবে না। নিছক কাব্যগুণে সমকালে সবচেয়ে প্রাণবন্ত এই কবির অসংযম আত্মবিলাসীতার পাশে দৃষ্টি রাখতে হবে তাঁর কবিতার বৈদ্যুতিক স্ফুরণের দিকে। যখন শব্দের যাদুকরী স্পর্শে তিনি জাগিয়ে দেন গূঢ়তর এক অর্থমণ্ডল, বা অনায়াস সৃষ্টি করেন চিত্রময় জগৎ একের পর এক ; সহজাত কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ শিল্পকর্ম যুক্ত হ'লেই যা সম্ভব হয় একমাত্র। উদাহরণস্বরূপ—

(১) জল যায়রে এমন দিনে চাঁচর মুখপানে
তারাভিলাষী মাতাল শুক ফেনার গাঢ় রাতে
পুড়িয়া মরে মান্দাসিনী ছুঁয়োনা মায়াভাণে
চরণমূলে চিহ্ন থাক শিলাবনত প'ড়ে।
(ভ্রান্তি। হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য)

(২) মৃদঙ্গ বাজত নারে নাচত চন্দন
চলো চন্দন মেলায় যাবো শূন্যমেলা চিতল ভঙ্গ,

নীরবে থেকো হে তারা সখি আঁধারতম আঁধার বন
লুলা হাতের পাতকী নাচে তুমিই তো মৃদঙ্গ রে ॥
(মুকুর : হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য)

(৩) ও দিকের মাঠে হাঁটে চাষা
আকাশেও সোনালি বাতাসা
জল পড়ে বুকের ভিতরে
দুরন্ত বাদল পোকা ঘুরে ঘুরে ওড়ে
জল পড়ে, শুধু জল পড়ে।
(জল পড়ে : ঈশ্বর থাকেন জলে)

এর প্রথমটিতে তিনি দেখিয়েছেন 'ফেনার গাঢ়' বা 'শিলাবনত'-র মত ভারী শব্দেও কতটা ঝংকার উঠতে পারে সংস্থাপনের গুণে। প্রকৃতপক্ষে শব্দ এখানে ব্যঞ্জনায় তার নিছক শব্দার্থকে এতদূরে ছাড়িয়ে যায় যে পরে মনে হয় এ ছাড়া আর কোন শব্দেরই ব্যবহার সুপ্রযুক্ত হতো না ঐ কবিতার পরিবেশে। আবার দ্বিতীয়টিতেই তিনি 'নাচত চন্দন' এর মত সুললিত বাক্যবন্ধের পাশে বসিয়ে দিয়েছেন আকাঁড়া 'লুলা' শব্দকে। খেয়াল খুশীতে নয়, চাতুরির জন্যও নয়, ঐ অমার্জিত শব্দটিই একমাত্র জীবনমেলার তালটিকে পূর্ণ করতে পারত। মার্জিত ও অমার্জিত দু'রকম শব্দই আলাদা ও সমন্বিত ব্যঞ্জনাসিদ্ধ প্রয়োগ শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর কবিতাকে বিশিষ্ট করে রাখে।

আর তৃতীয়টি তাঁর চিত্ররূপ নির্মাণের একটি ছোট্ট নিদর্শন হিসেবে দেখানো হয়েছে। দূরের মাঠে হেঁটে যাওয়া চাষার সঙ্গে দিনান্তের সূর্যের ছোট্ট হয়ে আসা আর তখনই বুকের ভিতরে দুরন্ত বাদল পোকার ঘুরে বেড়ানোর মত জল পড়ার বোধ যে জগৎ নির্মাণ করে ফেলে চকিতে, তা যেমন বানিয়ে হয় না— তেমনি সচেতন না হ'লেও হয় না। সচেতন মনস্কতা না থাকলে আমরা ডুবন্ত সূর্যের উপমায় 'সোনালি বাতাসা' পেতাম না বা অনুষঙ্গে নিবিড় হয়ে বাদল পোকাও আসতো না।

যে উপমা কবিতার প্রাণস্পন্দন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় তারও বহু বিচিত্র আয়োজন, 'গোলাপ স্থাপিত বক্ষ – মর্মর গঠিত আয়োজন'-এর মত গতানুগতিক উচ্চারণে নয় তার পরিচয় আছে অন্যত্র। যেমন 'রাতের উঠানগুলি বেলফুলমালার মতন / ক্রমক্ষীয়মানময় ; 'তোমার প্রতিমা / কৃত্তি কুমোরের গড়া ; 'তবু

রাগ কেউটের মতন / এখনো গর্জায় ; ব্যথা ছাপ মারে গোবরের তাল / গলির দেয়াল জুড়ে ;' এরকম অজস্র পংক্তিতে।

কবিতার ইতিহাসে তার আঙ্গিকের সিদ্ধি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঔদাসীন্য অতুলনীয়। শব্দ প্রয়োগ ও উচ্চারণের বিশিষ্ট ভঙ্গী তাঁকে অনন্য করে রাখলেও আঙ্গিক তাঁর একেক সময় একেক রকম। এবং এই বিচরণও কোন সুপরিকল্পিত উত্তরণ নয় বরং অনায়াস প্রতিভায় শত টুকরোয় ছড়িয়ে পড়া। ছন্দ প্রয়োগের বিষয়েও তেমনি। মূলত স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দোলানিতেই আমি তাঁকে সবচেয়ে প্রিয় মনে করি, এতে তাঁর যেমন দক্ষতা তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সারঙ্গ, যদি ঝর্ণা ফোটাই তুমি আসবে কি তুমি আসবে কি
সন্তর্পণ পল্লব দোলে এত অজস্র বন্ধু হাওয়া
গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি
পাহাড় খণ্ড পাহাড় খণ্ড ওর নৃত্যের দোষ নিয়োনা হে।
(ঝর্ণা : হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য)

এই অংশে 'অমন' শব্দটির স্বেচ্ছাকৃত ব্যবহার (সহজেই 'সে' করা যেত) বা প্রথম 'তুমি' শব্দটিকে আনা বাক্‌ভঙ্গীর উপর এমন একটা অতিরিক্ত দাবী প্রতিষ্ঠা করে যা সাহসী ও বিশিষ্ট। তবু এই ভঙ্গীর সবটুকু সম্ভাবনা যাচাই না করেই যেন তিনি চলে যান অক্ষরবৃত্ত বা টানা গদ্যে। বাংলা কবিতার যে কোন তন্ময় পাঠকের তখন কিছুটা অতৃপ্তির ক্ষোভ থেকে যায়ই। তার মানে এই নয় যে তিনি গদ্য বা অক্ষরবৃত্তে লিখবেন না। কিন্তু সেটা যদি হতো স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের ব্যাপ্তির কাজে আমাদের প্রত্যাশা মিটিয়ে !

বিশ্বাস করি এই লেখা থেকে এখন একথা স্পষ্ট যে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সব রকম contradiction। চীৎকার অথবা কান্না, আর্তনাদ অথবা সমর্পণ সব পাশাপাশি। যেমন এই সঙ্গে প্রকাশিত কবিতা পাঁচটি। 'এই পরিশ্রম' কবিতায় জীবন যাপনের এই পরিশ্রমের হাস্যকর অর্থহীনতার পাশাপাশি সহজ প্রত্যয়ে শান্ত উচ্চারণ আছে 'আজ' কবিতায়,

'আজ শুতে লাগবে নিচু একটুকরো জমি'

গানের বিশ্বাসের মতোই যা ফিরে ফিরে বলা হয়।

আবার 'জামা কত দিনে ছেঁড়ে' কবিতায় তাঁর উপমা চীৎকারের রঙে ফেটে পড়ে 'জামায় রক্তের দাগ পিছু-ফেরা বিপ্লবের মতো / থাকে ;.....'। তবে

এই তিনটি কবিতার একটি সাদৃশ্য আছে এদের টানা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। আর অপর কবিতা দুটি 'ছুটি' ও 'গুরুসদয় সড়কে' ছন্দের দোলার ব্যাপারে কাছাকাছি। এরমধ্যে 'ছুটি' কবিতাটি প্রায় পুনরাবৃত্তি এবং কিছুটা বেশী বলাও বটে। একই কবিতা ছিন্ন বিচ্ছিন্নে অনেক কম কথায় সংহত আছে। তবে এই গুচ্ছের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিতা 'গুরুসদয় সড়কে'। যে কোন মুহূর্তে যার মধ্যে কাহিনীর ছায়া বিশাল হয়ে উঠতে পারত তা কখন অনায়াস অলৌকিকে ভেজা চোখের পল্লবের কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এবং 'শিল্পে এই চোখের জল লাগাও ছিলো দরকার।'—যার ফলে গুরুসদয় সড়ক আর নিষ্প্রাণ রাস্তা থাকে না গভীর দুপুরের প্রকাশ্যেও রহস্যময় চরিত্র হয়ে ওঠে। এই কবিতাটিতেও কিছু সেই আকাঁড়া অর্ধপরিচিত শব্দের আবার বিস্ময়কর অনুভব ও প্রয়োগ দেখতে পাই।

কবিতার ক্ষেত্রে শেষ অবধি বুদ্ধি ও দর্শনের চাইতে তাঁর কাছে এই আবেগের contradictionই অনেক বড়ো। তাঁর সমস্ত অস্থিরতার মূলেই কাজ করে সেই নিঃসঙ্গ মানুষটির সংকট। যে জানে সবই বদলে যায়, যে নিজেকেই বলে 'শুধু বাঁধন, বদলে যাওয়া মূর্তিতে রঙ করো'; আবার যে অভিমানে ফেটে পড়ে :

অনেক তার পড়শি ছিলো ভালোবাসার তরে
আমার সাথে ছিলোনা তার চোখে দেখার মিল।

আসলে সেই গ্রাম, তার প্রেক্ষিত, সেই সোঁদা মাটির অনেক কাছে খোলস-হীন জীবনে বুক মেশানোর অন্তর্লীন টান কখন কবিসত্তাকে খড় পাতার ভেতরে নিয়ে যায়। তারপর সেই পাতাপুতার সঙ্গেই পুড়তে থাকে সে যে একদা বালক বয়সে বলেছিল 'মড়া পোড়াতে যাবোনা বৈকুণ্ঠ আমরা কি মরবোনা'। পুড়ে পুড়ে সে মাটির কাছাকাছি রূপান্তরিত হয়। সেই অর্ধদগ্ধ অঙ্গ ক্রমে যেন মৃৎযন্ত্র হয়ে ওঠে। 'মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অর্ধদগ্ধ জীবনবেদ সেই মৃদঙ্গ। তার চীৎকার এবং কান্না, সন্তানের সাশ্রুকাজ ও মন্ত্রোচ্চারণ সেই পুড়ে যাওয়া, নিঃসঙ্গে পরিণতির দিকে যাওয়া মানুষটির কবিতা, যা সমস্ত পরিকল্পনাহীন অসংযমের মধ্যেও সংগীতের গম্ভীর ধ্বনিতে অলৌকিক হয়ে ওঠে প্রক্ষিপ্ত মুহূর্তে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পাঁচটি কবিতা

গুরুসদয় সড়কে

গুরুসদয় সড়ক তোমায় বিশ্বাস করেনি

দুপাশে দুই খাকি শিবির, মধ্যিখানে পথটি
ট্যাক্সি ছায়া-আঠায় টেনে সুমুখে ঢালে অগ্নি
দুপুরে গর্হিত কাজের শান্তি ফুলকুসুম
গাঁয়ের মতো কখনো নয়, তোমার চুল উড়ছে

গুরুসদয় সড়ক তোমায় বিশ্বাস করেনি

গেরস্তের বিছানা খাট বিয়ের নখে খিমচে
দুপুরে এই চোরাপথের কামড় আর কুচ্ছো
কেন শঙ্খ? এলো-থাকা ঝোলের মাছ সাব্‌ড়ে
দেয়ালচূড়ে স্বপ্নঘুম—বিড়াল যেন মূর্তি
শিল্পে এই চোখের জল লাগাও ছিলো দরকার

গুরুসদয় সড়ক তোমায় বিশ্বাস করেনি।

ছুটি

আমি তোমার কালো পাখির চেয়েও কালো
ভালোই, ভালো
মন্দ শুধু একা একটি খাঁচার মধ্যে জড়িয়ে থাকা
দাঁড় হিসাবে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা
খোলা আকাশ নীল জানালার একটি মুঠি
বাতাস, তখন তোমার ছুটি।

বাঁদিকে

কাঁধে কুড়ুল, ঘুরছি—আমি
গাছের কাছে দাঁড়াতে চাই
বাঁদিকে পথ বাড়াতে চাই

কাঁধে কুড়ুল, ঘুরছি—আমি
চূড়ার ফুল মাড়াতে চাই
বাঁদিকে পথ বাড়াতে চাই
বাঁদিকে পথ বাড়াতে চাই

আমি একটি ফুলের কাছে দাঁড়িয়ে বলি, তুমি পাথর
গন্ধ চেয়ে হাত বাড়ালাম, পাপড়ি দিলে
পোড়া রূপের ওপরে কাল বাদামপাতা
দেখেছিলাম স্পর্শকাতর
পাথর কতো কোমল ছিলো নদীর ধারে

এই পরিশ্রম

লোকটিকে মানায় এই গাছপালা বাংলোর সমাধি
এখন, কয়েকটি দাঁত খসে গেছে শীতে
বুকের খাঁচায় টান পড়ে আচম্বিতে
পাখি নেই, পালক রয়েছে।

বারান্দার একপাশে হলুদ ডালের মতো হরিণ-রোদ্দুর
জঙ্গলের তাড়া খেয়ে চুপ করে আছে
জীবনের ছবি এই, এইটুকু রোদ্দুর পোহাতে
সে লাঠিতে ভর দিয়ে দিনের করাতে
কাঠ কাটতে যায়, কিছু পরিশ্রম করে
উনুন ধরায়, কিছু পরিশ্রম করে
ঢাকে কাঠি দেবে বলে পরিশ্রম করে
নিজেকে সপ্রাণ করে যেমন মানায়
—এই পরিশ্রম করে!

আজ

ওর শুতে লাগবে নিচু একটুকরো জমি
ডালিমগাছের নিচে বিছানাটি পাতো

সবং-মাদুর দাও, হোক ছেঁড়াফাটা
ওর শুতে লাগবে নিচু একটুকরো জমি
ইটে তুলে রাখো ওর অবসন্ন মাথা
হাতদুটি টেনে আনো বুকের উপরে
গোড়ালির কাছে মাটি রাখো উঁচু করে
ওর শুতে লাগবে নিচু একটুকরো জমি
একটি প্রদীপ দিও বিছানার পাশে
ডালিমের রাঙাফুল নিশ্চিন্ত বাতাসে
ঝরে পড়বে, ভালোবাসা গাছ পুঁতেছিলো!
ও তাকে প্রসিদ্ধ ঐ প্রাসাদে রেখেছে
আজ শুতে লাগবে নিচু একটুকরো জমি।

জামা কতদিনে ছেঁড়ে

মানুষ যখন কাঁদে, মানুষের সাধ্য কি, থামায়?
নদীর নিকটে গিয়ে কাঁদে, কাঁদে পাথরের পাশে
মাঠের ভিতরে গিয়ে কাঁদে একা, চোখ তুলে আকাশে—
সাধ্য কি, থামায় তাকে? একা কাঁদে, সংঘে কি কাঁদে না?
মানুষ যখন কাঁদে, মানুষের সাধ্য কি, থামায়?
চোখ ফেটে রক্ত পড়ে, সেই রক্ত উজ্জ্বল জামায়
লেগে থাকে, বৃষ্টিজল ধুলো থেকে মুক্ত করে পাতা
রক্তের উপরে তার জারিজুরি খাটেনা কিছুই
জামায় রক্তের দাগ পিছু-ফেরা বিপ্লবের মতো
থাকে, জামা কতদিনে ছেঁড়ে?

বিশেষ রচনা

কি পড়ি

["কী পড়ি" বিভাবের নতুন বিভাগ। আগামী কয়েকটি সংখ্যায় বাংলা দেশের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক, কবিরা এ বিভাগে লিখবেন। ক্রমশঃ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্র জগতের ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের রচনাও এ বিভাগে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। তবে এ বিভাগের পরিকল্পনা আমরা অশেষ আগ্রহ নিয়ে করলেও, সময়মত লেখা পাওয়ার ওপরই যেহেতু এর ধারাবাহিকতা নির্ভর করে, সেহেতু মুদ্রণে বয়সের অনুক্রম বজায় রাখা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। তাই নামের বর্ণানুক্রমিক ক্রম অনুযায়ীই লেখাগুলি ছাপা হবে। আর একটি কথা, লেখক নির্বাচনে আমরা বিশেষ কোনো নিরিখ রাখিনি ইচ্ছে করেই। কেননা সকলের সঙ্গে যোগাযোগ ও লেখা সংগ্রহ সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। তা ছাড়া কেউ কেউ এ ধরনের লেখা লিখতে রাজী নাও হতে পারেন। তাই অগ্রিম মার্জনা চেয়ে রাখছি। তবে উল্লেখযোগ্য প্রত্যেককেই আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। এ সংখ্যায় লিখেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ। — সম্পাদক]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

লেখককে এ-রকম বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলার কোনো অর্থ হয়? নিজের দুর্বলতা নিজেকেই টেনে বার করতে বলা। আজকের লেখকদের মধ্যে ক'জন ফুল-টাইম লেখক যে, তাঁদের নিজের লেখার অবকাশ যত অন্যের লেখা পড়ার অবকাশও ততো? আজকাল বেশির ভাগ লেখকেরই আমার দশা। তাঁরা কিছু না কিছু

চাকরি করেন, তার ফাঁকে একটু সময় করে নিয়ে লেখেন। এর বাইরে যেটুকু পড়া সেটা নিজের প্রয়োজনের পড়া, আর যা না পড়লে নয়—তাই পড়া। হাতে গোণা যে দুই একজন লেখক চাকরি বাকরি বা ব্যবসা-ট্যাবসা করেন না, শুধুই লেখেন—তাঁরা অন্যের লেখা কতটা পড়েন সে-সম্পর্কে আমার স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। আগের দিনের লেখকরা যাঁরা শুধুই লিখতেন, তাঁদের শুনেছি নিজের লেখা থেকে অন্যের লেখা পড়ার আগ্রহ কম ছিল না।

যাক্, আমি শুধু আমার কথাই বলতে পারি। সাহিত্যের আসরে আসার একটা প্রস্তুতি গোচরে বা অগোচরে সব লেখকেরই থাকে বলে আমার বিশ্বাস। তখন তো আর লেখার চাহিদায় হিমসিম খেতে হয় না। তাই সেই সময়টা হল পড়তে ভালো লাগার সময়, আর পড়ার সময়। এই ভালো লাগা এবং পড়াটাই পরোক্ষ প্রস্তুতি। সাহিত্য জীবনের সেই শৈশবে মনে আছে, হাতের কাছে যা পেয়েছি গো-গ্রাসে পড়ে ফেলেছি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস এবং কিছু কবিতা, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর একবার নয়, একাধিক বার পড়েছি। অবশ্য শেষের দু'জনের পড়ার সময় সামনের সারিতে না হোক, সাহিত্যের পিছনের সারিতে একটু জায়গা পাওয়ার স্বপ্ন ভিতরে দানা বেঁধে উঠেছে। তখনো অবকাশ অনেক, পড়ার আগ্রহও নিবিড়। তাই নরেশ সেনগুপ্ত, সৌরেন মুখুজ্জে, পাঁচকড়ি দে, দীনেন রায়, স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, বিভূতি মুখুজ্জে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু—এঁদের ভালো-মন্দ নির্বিশেষে যে-বই হাতে পেয়েছি তাই পড়ে গেছি। একই সঙ্গে আবার বিদেশী সাহিত্য অর্থাৎ ক্লাসিক পর্যায়ের বইগুলি হাতে পাওয়ার জন্যে কলকাতার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চলে গেছি।

…জীবন নদীতে এর পর অনেক জল গড়িয়েছে। এক পারের অনেক ভেঙেছে তো অন্য পারের অনেক গড়ে উঠেছে। অনেক হতাশা দেখেছি, অনেক প্রত্যাশার হাতছানিও। পড়ার পাল্লাটা আপনিই কখন হাল্কা হয়ে ওপরের দিকে ঠেলে উঠেছে। এর আরো একটা বিশেষ কারণ আছে। চাকরি জীবনে দীর্ঘকাল কোনো বড় দৈনিক কাগজের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ছিলাম। বছরের পর বছর কাঁচা-পাকা লেখকের হাতে-লেখা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ পড়তে হয়েছে। সেটাই চাকরির অঙ্গ ছিল। ভালো লেখা পড়তে হবে, মাঝারি পড়তে হবে, অখাদ্য লেখারও পাতা ওলটাতে হবে।

আবার কাটা-ছেঁড়া করে ভালো-মন্দের মিশেল লেখা থেকে শুধু ভালোটুকু ছেঁকে তুলতে হবে। গায়ে জ্বর আসত। এই কারণেই রসের পড়া বা নিজের তৃপ্তির পড়ায় বেশ ছেদ পড়ে গেছে। এখন যেটুকু পড়া, তার বেশির ভাগই নিজের পেশাগত স্বার্থের পড়া। এরও ব্যতিক্রম যে ঘটে না, তা নয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে যে লেখক আবার আদ্যোপান্ত পড়িয়ে ছাড়েন, তাঁর হাত থেকে অব্যাহতি কোথায়? সেটা লেখা বা লেখকের গুণ, পাঠকের নয়। তবে সময় পেলে নিজেকে ভোলাবার জন্য কোন্ লেখা আমি এখনো বেশি পড়ি শুনলে পাঠক হাসবেন কি অবাক হবেন জানি না। সেই লেখার নাম শিশু সাহিত্য। ছোটদের গল্প, ছোটদের উপন্যাসও। যত বয়েসই হোক, মানুষের মধ্যে এক চির শিশু শেষ পর্যন্তও থেকে যায় কিনা আমি বলতে পারি না। গল্পে হোক, উপন্যাসে হোক এই শিশুর জগতে ফিরে যেতে আমার ভালো লাগে। যে-জগতে জটিলতা নেই, যুক্তি-তর্ক নেই, বাসনার উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, কুটিল লোভের হানাহানি নেই।

এমন বই হাতে এলে কাজ ফেলেও পড়ে ফেলি।

বিমল কর

প্রীতিভাজনেষু,

সমরেন্দ্র, তুমি আমায় মুশকিলে ফেলেছ; জানতে চেয়েছ—আমি আজকাল পড়াশোনার চর্চা রেখেছি কিনা? রেখে থাকলে কী ধরনের বইটই পড়ি?

তোমায় বলতে লজ্জা নেই, আমি বরাবরই খেয়াল খুশিমতন বই পড়ি। পাঠক হিসেবে আমাকে তুমি কী বলবে জানি না, তবে আমি নিজে মনে করি, এলোমেলো ভাবে পড়াশোনা করার দরুন আমার ক্ষতিই বেশি হয়েছে। বোধ হয় একটা মোটামুটি ডিসিপ্লিন থাকলে ভাল হত।

একটা সময় ছিল যখন চৌরঙ্গি পাড়ার বুক স্টল থেকে চমকপ্রদ কিছু দেখলেই কিনে ফেলতাম, কিংবা লোভ হত কেনবার। বিশেষ করে গল্প উপন্যাস। মাঝে মাঝে প্রবন্ধর বইও কিনেছি। এতে কতটা লাভ হয়েছে বলতে পারব না, তবে বিদেশের কোনো কোনো হাল লেখকের লেখার সঙ্গে অল্পস্বল্প পরিচয় ঘটেছিল। এদের মধ্যে দু'এক জনের কথা আমার মনে আছে আজও, যাঁরা এখানে খুব একটা পরিচিত কিংবা প্রচলিত ছিলেন না তখন।

আমি নিজে গল্প উপন্যাস লিখি বলে আমার বেশির ভাগ ঝোঁক ছিল ওই

দিকে। কেন ছিল তাও বুঝতে পারি। কিছু শেখার চেষ্টা করতাম। তা ছাড়া একালের লেখকদের মেজাজটাও বুঝতে চাইতাম। তবে তোমায় আগেই বলেছি, আমার স্বভাবে ধৈর্য কম, কোনে একটা বিষয় নিয়ে লেগে থাকার জোর নেই, ফলে আখেরে আমার কোনো লাভ হল না তেমন। আবার অনেক সময় লোভে পড়ে এমন বই কিনে ফেলেছি যা আমি শেষ পর্যন্ত পড়তেও পারি নি।

আজকাল এই ধরনের অভ্যেস আর প্রায় নেই। কখনও কখনও অন্যের মারফতে হাতে আসে, কিংবা নিজেও দু' একটা কিনে ফেলি। উৎসাহ পাই না, ভাল লাগে না। কদাচিত তেমন কিছু হাতে আসে যা ভাল লাগে।

বয়েস হয়ে গেলে বোধ হয় মানুষের এক ধরনের গোঁড়ামি এসে যায়। আমি আজকাল পুরোনো লেখা পড়তেই ভালবাসি। সে বাংলাই হোক আর বিদেশীই হোক। বরং এখন যেন আরও ভাল লাগে।

আমার তেমন কিছু বিশেষ শিক্ষা নেই—কিন্তু মনোবিজ্ঞান আর দর্শনের বইটই পড়তে আগ্রহ বোধ করি। যদি খুব একটা অ্যাকাডেমিক না হয়—তবে এই ধরনের বই আমি যথাসাধ্য যত্নের সঙ্গে পড়ার চেষ্টা করি।

সাহিত্য বিষয়ের প্রবন্ধ, যার মধ্যে সরসতা আছে, কেই বা না পড়ে! আমি সেই ধরনের সাহিত্য-প্রবন্ধ পড়তে ভালবাসি যা আমাদের নতুন করে কিছু ভাবতে শেখায়। কিংবা কোনো স্বল্প পরিচিত লেখককে, অথবা কতিপয় লেখককে—আমাদের কাছে এমন করে হাজির করে দেয় যাতে তাদের বৈশিষ্ট্য, মানসিকতা বুঝতে পারি।

নির্দিষ্ট করে কিছু পড়া এখন আর হয় না। তবু একেবারে না পড়েই বা থাকা যায় কি করে, তাই যখন যা জোটে পড়ার চেষ্টা করি। আমার আবার 'অ্যাসটোনমি'-র বই, যদি সহজবোধ্য হয় পড়তে ভাল লাগে। এ-রকম রহস্যময় বিষয় কমই আছে।

তোমায় বলতে ভুলে গেছি, জীবনী পড়তেও আমার ভাল লাগে। বিশেষ করে সেই জীবনী যদি কোনো শিল্পীর হয়। একবার রুরকেলা থেকে ফেরার পথে আমার এক সহযাত্রীর বই আমি প্রায় চুরিই করে বসলাম। দারুণ জীবনী। সংগীতকারের। মেন্‌ডলসনের। আমাদের বাংলায় এমন জীবনী কেন লেখা হয় না? ধরো, অমর দত্তকে নিয়ে এমন জীবনী তো লেখা চলত। অমর দত্ত মশাইয়ের জীবনী যা আছে তা খারাপ নয়—তবে সেটা নিছক জীবনী, অন্য কিছু নয়।

মোটামুটি যা মনে এল তোমায় বললাম। এই ধরনের লেখা আমার হয় না। তুমি এত তাগাদা দিচ্ছ যে অনেক চেষ্টা করেও এড়াতে পারছি না।

প্রীতি জেনো।

বিমলদা

রমাপদ চৌধুরী

একটি প্রশ্ন প্রায়ই শুনতে হয়। শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যেহেতু আমি একজন লেখক, অনেকেই কথা খুঁজে না পেয়ে জিগ্যেস করে বসেন, কি লিখছেন? বলতে ইচ্ছে করে, যা এতকাল লিখেছি তার কোন খবর আপনি রাখেন? আমার শেষ লেখা কি, আপনি জানেন! পড়েছেন সেটা? আমার মত রূঢ়বাক্ মানুষটিও সে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না, কারণ যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে ব্যক্তিটি লেখক এবং সেটাই তার লজ্জা। অথচ ভিতরে ভিতরে সেটাই তার চরম অহঙ্কার।

অবশ্য তার চেয়েও অবাক হতে হয় যখন কেউ এসে জিগ্যেস করেন, কি পড়ি, বা কি পড়ছি? এ প্রশ্ন সাধারণ মানুষরা করেন না। সাধারণ পাঠকদের এ বিষয়ে কোন আগ্রহ থাকার কথা নয়। প্রশ্নটা আসে, প্রায়ই দেখেছি তরুণ গল্প লেখক বা কবিদের কাছ থেকে। বুঝতে পারি, এর পিছনে কিছু অভিমান আছে, কিছু অভিযোগ। অর্থাৎ তাঁদের লেখা গল্পটল্প বা কবিতাটবিতা কেন পড়ি না।

স্বীকার করে নেওয়া ভাল, এ অভিযোগ বা অভিমান একদা আমারও ছিল। এখনো নেই এমন কথা হলপ করে বলতে পারবো না। কিন্তু কেন পড়ি না তাও স্পষ্ট করে বলা দরকার।

একসময় আমরাও ছোট ছিলাম, পড়ার নেশা ছিল অন্যরকম। গল্প-উপন্যাস-কবিতা ছাড়া পৃথিবীতে আর যা কিছু পাঠ্য তাকে তখন পাঠ্যপুস্তকই মনে করতাম। সাহিত্যের এই দিকটা নিয়ে মেতে থাকাই যেন সবচেয়ে বড় কথা। মনে হত নরওয়ের কোন লেখক ইতালীর কোন কবি কি লিখলেন সেটা পড়ে না ফেললে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

হয়তো একসময় ওসব প্রচুর পড়েছি বলেই এখন রুচি বদলে গেছে।

তবে, কিছুই কি পড়ি না? বছরে নবীনে প্রবীণে লেখা গোটা পঞ্চাশ তথাকথিত ছোট গল্প পড়তে বাধ্য হই, শ'খানেক প্রবন্ধ, চার ডজন কবিতা, আধ ডজনের চেয়েও বেশি উপন্যাসিকা, আরো কত কি। তবে সাহিত্যপাঠক হিসেবে

নয়। এগুলো পড়তে বাধ্য হই কারণ পড়ার সঙ্গে আমার কর্মজীবনও জড়িত। কোন পাঠকও হলপ করে বলতে পারেন না অন্তত একটি পূজা-সংখ্যার প্রথম পাতা থেকে শেষ পৃষ্ঠা অবধি পড়েছেন কখনো। আমি পড়ি। পড়তে বাধ্য হই। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। পাঠক হিসেবে আমি কি পড়ি?

শুনলে অবাক হবেন, আমার আকর্ষণ অন্যত্র। ও ডি বি এল নামে সুনীতি চাটুজ্যের সেই অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা শুধু কানেই শুনে এসেছি। সম্প্রতি নতুন করে ও বই আড়াই খণ্ডে ছাপা হয়েছে। এবং পরমাশ্চর্য ব্যাপার, বইটা সংগ্রহ হতেই পড়ে ফেলেছি গত পনেরো দিনে। কারণ এ-বই পড়ে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না। থিসিস লিখতে হবে না। গোয়েন্দা উপন্যাসের চেয়েও তাই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। কথাটা প্রচলিত উপমা। আমরা লেখকরা যেমন ব্যবহার করি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি গোয়েন্দা উপন্যাসে কোন আকর্ষণ বোধ করি না। ছাত্রাবস্থায় শার্লক হোম্‌সের হাউণ্ড অফ বাসকারভিলস পড়েছিলাম, এবং আগাথা ক্রিস্টির 'মিস্‌টিরিয়াস অ্যাফেয়ার্স অ্যাট স্টাইল্‌স্'—ব্যস্। আর ব্যোমকেশের গোটা কয়েক গল্প। এখন দুঃখ হচ্ছে ও ডি বি এল এতকাল পড়িনি কেন। আগে পড়া থাকলে বহু সখের পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে ভুল ধারণাগুলি মেনে নিতাম না।

এত সব চমকপ্রদ তথ্য আছে বইটিতে ভাবতেই পারি নি। কে জানতো সংস্কৃত দু' হাজার ধাতুর মধ্যে মাত্র দু'শোটি বেদ ও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। বাকী সবই পরবর্তীকালের! কে জানতো আমরা যেমন লিখিটিখি, পড়িটড়ি, তেমনি জাপানীরাও বলে টোকোরো ডোকোরো, কিংবা পার্সিয়ানরা: স্তুতার মুতার।

সম্প্রতি ধরেছি চার্লস ডারুইনের 'দি অরিজিন অফ স্পীসিজ'। একটু দুরূহ লাগছে, তাছাড়া যা ইতিমধ্যে প্রমাণিত এবং স্বীকৃত হয়ে গেছে তা প্রমাণ করার জন্যে এত কাঠখড় জড়ো করেছেন ভদ্রলোক, যে বইখানা রীতিমত বোরিং লাগছে। তবে বুঝতে পারছি সহজ ব্যাপারকেও গ্রহণযোগ্য করতে তাঁকেও কি অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছে।

বাশামের ইতিহাসে হাতেখড়ি হয়েছে অনেক আগে, গত কয়েক মাসের মধ্যে পড়েছি কোশম্বীর দু'খানা বই। মুগ্ধ হয়েছি। বঙ্কুবিহারী মুখুজ্যের হরপ্পার লিপিপাঠ পরীক্ষা করে দেখেছি কয়েক সপ্তাহ। খুব বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে নি। জুং-এর লেখা পরমাণুবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক গবেষণার একখানা বই অনেক আগে পড়েছিলাম। দারুণ। মনে হয়েছিল বিজ্ঞানীরা মানুষ

হিসেবে আমাদের চেয়ে কত বড়। বইটার নাম ব্রাইটার দ্যান এ থাউজেণ্ড সান্‌স্‌। এখন দেখছি, তারা কত ছোট। পড়ছি : কমপিউটার সায়েন্সের ইতিবৃত্ত। সদ্য বেরিয়েছে। আলফ্রেড টোকিন্সের 'দি লস্ট ডিজিটস', আমার এক আত্মীয় পাঠিয়েছে আমেরিকা থেকে। অসাধারণ বই।

পৃথিবীতে এত সব জিনিস জানার আছে, এত সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করার আছে, আগে তো জানতামই না। বয়স না হলে বোধহয় জানা যায় না। জানা যায় না, নতুন বইয়ের পিছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ানো অর্থহীন, যে বই পড়ি নি সেই বইই তো নতুন বই।

ফলে, দু'একটা কবিতা কিংবা গল্প যদি পড়া না হয়ে ওঠে, তাতে আমার কি খুব ক্ষতি হবে? ক্ষতি সেই কবি বা গল্পকারেরও হবে না। সুতরাং, আমার হাতে এখন যেটুকু সময় আছে, একটু এভাবেই খরচ করতে চাই। গল্প কবিতা পড়ার কাজটা বরং আপনারাই করুন।

সন্তোষকুমার ঘোষ

কী পড়ি, অথবা যা পড়ি? সম্পাদক মশাই, যদি, আহা, দ্বিতীয়টা আপনার ফরমাস হত। তাহলে আমার বাচালতা ঢের বেশি স্ফূর্তি পেত। কিন্তু আপনি তো আদেশ করেছেন প্রথমটা, তাই না? অর্থাৎ, কী পড়ি। জবাবে যদি বলতে পারতাম, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না", যদি কবুল করা যেত, "ক" অক্ষর দেখে যিনি কেঁদে আকুল, আমি সেই প্রহ্লাদ, তাহলে কী দারুণই না হত! প্রহ্লাদে-আহ্লাদে পদ্যের মতো মিলে যেত। নিরক্ষরতার বাড়া আশীর্বাদ নেই। অস্বীকৃতির চেয়ে বে-বল্‌গা বে-পরোয়া কোনও সুখ নেই। বিলকুল তুরীয়। হরফগুলো কেলে কেলে পিপড়ের মত মিছিল করে যায়। মিছিল, তথাপি কলরোল দূরে থাক স্বরও নেই। পিঁপড়েরা পরস্পরকে যা বলার তা ঠিকই বলে। হরফরাও বলে। তবে উভয়ের কোনোটিরই কোনও রব নেই। না থাক তবু বলাটা তো আছে!

আরে মশাই, পড়বই যদি, তবে অ্যাদ্দিনে ইউনিভারসিটির চিলেকোঠায় চড়ে যদিদং কিঞ্চ জগৎটাকে ডিগ্রিধারী চোখে আলবৎ অপাঙ্গে দেখতাম। তেরছা নজরে আর কি! স্ত্রীর কোন্‌ ভ্রাতৃবর বলবে যে, আমি আই এ এস (ধ্বনিতে "অ্যাস্‌" কথাটার সঙ্গে কী অদ্ভুত মিলে যায় দেখেছেন!) এবং পরিণামে চিফ্‌ সেক্রেটারি অবশ্যই বনে যেতাম। সময়কালে পড়িনি তো! তখন

শুধু জপেছি, লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি চাপা পড়ে সেই—তাই এই হাল। আস্তাকুড়ে আছি। অবহেলায়, অজ্ঞানে। আমি অজ্ঞান? সে তো মজবুর, কিন্তু আমার সম্পর্কেও প্রায় সব্‌বাই অ-জ্ঞান যে! সেই অভিযোগ-অভিমান থাক। এবার বরং বলি, পড়া আর শোনার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তুঙ্গে ওঠা যায়। যেমন মন্ত্রীগিরি। আমার কপালে বেবাক ঢুঁ-ঢুঁ।

এতক্ষণ ন্যাকামি করলাম। চূড়ান্ত নিরক্ষর আমি নই। অল্প-সল্প বর্ণপরিচয় নিশ্চয় আছে। তার সঙ্গে শিশুশিক্ষা, চারুপাঠ, কথামালা ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে, তাই তো এই বিপত্তি। সম্পূর্ণ অজ্ঞান তিমিরান্ধকে কোনও গুরুদেব জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তাঁর অসীম কৃপায় আর করুণায় বিদ্ধ করলেও করতে পারেন। আমার সমস্যা এই, আমি আধখানা জানি। জানি না যে, যাঁর দেওয়ার তিনি হয় শূন্য নয় পূর্ণকে পাস্‌ মারক্‌ দেন। আর যারা অর্ধপক্ক বা অর্ধশিক্ষিত? তাদের জন্যে ঢ্যাঁড়া। ললাটঙ্ক লিখন।

যখন কাজে লাগত, তখন পাঠে মন দিইনি। পরে যখন আর দরকার নেই, তখন বইপত্তর নিয়ে টানাটানি খোঁজাখুঁজি শুরু। হাতে যা পড়ে, চোখে যা আসে, তাই গিলি। সেই গেলাটাও গেলা, সেই পড়াটাও পড়া। তবে হায়, কেবলই বানান করে করে। আসলে তখনকার পড়াটাও পতন। আজ যখন উত্থান-পতন কিছুই নেই, তখন, একটা বয়সে পৌঁছে টের পাচ্ছি, সকালবেলায় ভালোভাবে পড়তে বসলে ভালো হত। একেবারে ভয়শূন্য ভ্যাকুয়াম দশা থেকে যে পড়ে, তার তবু ওঠার আশা থাকে। যেসব পাঠক শব্দকে কল্পদ্রুম জ্ঞান করেন না, তাঁদের হিতার্থে বলি, আগেকার বাক্যটিতে "পড়ে" কথাটার দুটো মানে।

আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না যে, পড়া মানে পড়ে যাওয়া। তাই না-ওঠা, না-পড়া একটা ত্রিশঙ্কু দশায় দুলতে দুলতেই আবার বলছি, সেই আধখানা পড়াই কাল হয়েছিল আমার। অর্ধং ত্যজতি নীতি সার করে বাঁচেন শুধু পণ্ডিতেরা। আমার মতো যারা বেভুল বেলেল্লা লোক, তাদের অর্ধ অর্থাৎ আধখানা গ্রহণ করা মানে কপালে "গেরোন্‌" লাগা।

এখন? খালি গরুর মতো গেরাসে যা পাই, তাই খাই। সাধু ভাষায় একেই গোগ্রাস না কী বলে যেন? আমিও সেই মতো ইদানীং পাঠ্য-অপাঠ্য যা পাই তারই উপরে হামলে পড়ি। তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই, খিদে-খাঁ-খাঁ আর অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে মৌল কোনও তফাত নেই। একজন যদি সামনে

যে-পাত্তরটা ধরা আছে, তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আর একজন তেমনই খাঁই খাঁই করে চিবোয়, ছাপানো পাতার পর পাতা। আখেরী বিচারে বঞ্চিত দুজনেই। বঞ্চিতদের বাছবিচার নেই।

অস্থি আর চর্মসার চেহারা। একজনের শরীরের, আর একজনের মনের। এও কি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে যে, খেতে যে পায় না, তার শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া, আর মনকে যে উপোসী রেখেছে, তারও ওই দুটি জিনিস বই ডুগডুগি বাজাবার কিছু নেই।

এতটা লিখে মনে হচ্ছে, বোধ হয় মিছে কথা বললাম। যা পাই তাই এককালে পড়তাম বটে, ইদানীং মন আর সায় দেয় না। যেসব কাব্যি ছাপাটাপা হয়, তা দিব্যি লাগে বটে, তবু পড়ার পরে, বলব কী মশাই, সব কর্পূরের মতো মিলিয়ে যায়। কী বলব? বয়সের দোষ না লেখারই দোষ? "আবিত্তি" টাবিত্তি করার কথা তো ওঠেই না। পড়লাম, মানে পতিত হলাম, তার পরেই পঠিত লাইনগুলো রূপকথার পরীদের মতো মিলিয়ে গেল। কোন্ কবিতায় কোন্ মূল্যকে মেনে নিয়েছি, সোহাগ, ভালোবাসা ইত্যাদি, কোন্‌টাতে বা ঝরেছে রক্ত, কোন্‌টাতে রগ ফুলে-ফুঁসে ফেঁপে উঠেছে, কিছু আর মনে থাকে না। মায়াবী অনুভব, সকালে উঠে ঘাসের উপরে যে-শিশিরের জাল পাতা থাকে, কই—বিরল কিছু ব্যতিক্রম বাদে—আজকাল তো আর ছন্দে-অছন্দে বাঁধা লেখায় তেমন চোখে পড়ে না! স্মরণের আবরণে যত্নে ঢেকে রাখব কী? রাখার মতো কিছু যদি না-ই থাকে! আবার বলি কিঞ্চিদপি ব্যতিক্রম আছে। তবু গরিষ্ঠ দিয়েই বিচার, তাই না?

তবু পড়ি। পড়ে যাই। গল্প-উপন্যাসে যত হইচই, পাঠান্তে দেখি, পুষে রাখার মতো চরিত্র বা ঘটনা—কিচ্ছু নেই। বুঝলাম, সেইটেই হাল-কালের ফ্যাশন। তা সত্ত্বেও কিছু তো থাকবে! সেই অনুভূতি, যা হেঁটে গেলে শুকনো পাতা বা খড় মাড়িয়ে গেলে মড়মড় শব্দ তুলবে! বেশির ভাগই শুধু আওয়াজ, বলাবাহুল্য, ফাঁকা আওয়াজ। দলবদ্ধ চিৎকার। তার চেয়ে বেশি নয়। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু-একটি গুলিবিদ্ধ করে। আমাদের জন্যে মনের আকাশে মেঘ ডেকে আনে, আমাদের সেই মেঘের মমতার তলায় ঢেকে রাখে।

বড়ো কম, বড়ো কম। হল্লা যত, তার তুলনায় নির্ভুল শরসন্ধানের সংখ্যা বড়োই সামান্য। কী কবিতায়, কী কথাসাহিত্যে। কী বঙ্গদেশের, কী বিদেশের।

মহীরুহ-র দেখা পাই না। না ছায়া, না নীড়। না এমন কোনও ভাবনা বা যন্ত্রণা যা অনেক দিন ধরে আমাকে আততায়ী বা হত্যাকারীর মতো অনুসরণ করবে। আমি তাই আজকাল তথাকথিত প্রবন্ধ-নিবন্ধেই মুখ গুঁজি। তারও বেশির ভাগ কুলিখিত, অসার। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সত্য না পাই, কোনও না কোনও তথ্য তো পেয়ে যাই—যা আমার জানা ছিল না! আমার জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়।

আমার জবানবন্দী এই, বাংলা কবিতা আর বিস্তর বড়াইবাজ গল্প-উপন্যাস ইত্যাদিকে শুধু দলবাজির আলোড়ন নয়, শক্ত কিছু ধরতে হবে। গভীর সমুদ্রে ভাসমান অসহায় মানুষ যেভাবে কোনও কঠিন কাঠ বা শিলাকে আঁকড়ে ধরে। সেইখানেই প্রাণ। প্রাণহীন শব্দসর্বস্ব কেবলই কথার ছলনার আয়ু বেশি নয়। সুস্থ, স্থিত আর স্থায়ী হতে হলে—ছবির ভাষাতে বলছি—জলরঙ নয়, উড্‌কাট বা এচিং চাই। এমন কিছু, যা প্রতীয়মান হয়, কী চরিত্রে, কী অনুভবে, কী বিশ্লেষণে, আমাদের চঞ্চল করে, জাগায়। বিশ্বসাহিত্যেও আজ এর দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশ থেকে ভিক্ষা নেওয়ার অর্থ নেই। আমরা যেন আমাদের মতো করে লিখি। রূপ দিই কোনও আনন্দকে, কোনও বিষাদকে। আর আনন্দ আর বিষাদ ছাপিয়েও যা, সেই চির-তাকে।

কোনও লেখার নাম করলাম না। না ভালোর, না মন্দর। সেই অর্থে এই লেখাটা বিমূর্ত। খালি উৎকট উল্লাসে দলগত দশক-মার্‌কা উচ্ছ্বাসে ধ্রুব কিছু নেই, অসম সাহসিকতায় এই কথাই বললাম। সম্পাদক মহাশয়, আমি পড়ি বিস্তর (বলেছি না, যা পাই তাই গোগ্রাসে গিলি!) কিন্তু যে লেখা আমাকে দীর্ঘকাল হন্যে হয়ে তল্লাশ করবে, ইদানীংকার গদ্য আর পদ্যের বেজায় কারুকিরি সত্ত্বেও তেমন লেখা কমই দেখি। ইনি চমৎকার মিল দিয়েছেন, উনি গদ্যে অসম্ভব একটা বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, নিছক এই দিয়ে সব হয় না। অনাগত কালের কাছে, এমন কি সমাগত কালে নিজের কাছেও একটা জবাবদিহি বাকি আছে। জোট-বাঁধা উচ্চৈঃস্রব আওয়াজে সেই দায়টাকে চাপা দেওয়া যায় না।

আসল কথা হাজির হতে হবে। আসল কথা হাজির থাকতেও হবে। নইলে সব ফুলঝুরি, সব হাজারো মিনি কাগজে ছড়ানো চিটচিটে আত্মরতির চিহ্ন। মিনিকে ম্যাক্‌সি হতে হবে।

ফতোয়া দিচ্ছি না। সামান্য পড়ুয়া হিসেবে সবিনয়ে বলছি। হে সম্পাদক, আপনি এতক্ষণে বোধ হয় বুঝেছেন, শুরুতেই কেন কিচ্ছু পড়ি না, কিচ্ছু না

বলেছিলাম? এই হিং টিং ছট-মার্কা পদ্য আর হাড়মাসহীন গল্পের গদ্য—যোগফল মিলিয়ে কিচ্ছু হচ্ছে না। হচ্ছে না বলেই কিচ্ছু পড়ছি না বলেছি। অর্থাৎ সজ্ঞানে মিথ্যে। না পড়তে পারলেই বরং বেশ হত।

এই লোকটার কাছ থেকে একটি রচনা বাসনা করে কী ভুল করেছেন, অবশেষে আপনি বুঝতে পেরেছেন তো? যা লিখলাম, তা বেশি বয়সের দোষ। তবু পুনশ্চ হিসেবে জুড়ে দিতে চাই, বয়সের দোষ, না হালফিল যা লেখা হয়, যা পড়ি, তারই দোষ?

ব্যক্তিগত রচনা

চতুঃসপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমার একটি গল্পের নাম "মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে"। গল্পের নায়কের মতো আমিও এখন মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে। কিন্তু এখন আমি ওর মতো সম্পূর্ণ হতাশ আর ক্লান্ত আর ব্যর্থ নই। দেশের মতিগতি অপ্রত্যাশিত এক মোড় নিয়েছে। কী করে এই অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হলো কেউ ঠিক জানে না। যে যার খুশিমতো অনুমান করছে। তা হলে আমিই বা কেন আমার খুশিমতো অনুমান করব না? আমার অনুমানটা এই যে ভারতের অন্তরে আছে এক স্বয়ংশোধিকা শক্তি। সে আপনাকে আপনি সংশোধন করতে পারে। বরাবরই এই শক্তির উপর আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু মাঝখানে এ বিশ্বাস টলমল করছিল। সেই টলমলে ভাবটা কেটে গেছে। ভুল যদি আবার কোনোদিন ঘটে তবে তার সংশোধনও আবার একদিন ঘটবে। না, আমি আর হতাশ নই। আমিও একটু আধটু সংশোধনের চেষ্টা করেছি। সুতরাং আমি ব্যর্থ নই। কিন্তু ক্লান্ত। আমি এখনো ক্লান্ত। এ ক্লান্তি বার্ধক্য থেকে নয়। অতিশ্রম থেকেও নয়। আমার চাই একটা রসায়ন। যে রসায়ন আবার আমাকে সৃষ্টিতৎপর করবে। ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে আমি যা দেবার তা দিয়েছি। কিন্তু আর্টিস্ট হিসাবে যা দিতে চেয়েছি তা দিতে পারিনি। দিতে হবে, এটাই আমার উপর জীবনদেবতার নির্দেশ। এইজন্যেই বাঁচা। মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে এসে পৌঁছলেও প্রস্থানের জন্যে আমি প্রস্তুত নই। আমার প্রস্তুতিটা নতুন এক সৃষ্টির জন্যে। তার জন্যে চাই একটা রসায়ন। প্রতীক্ষায় আছি।

আমার কাছে দেশ যেমন সত্য যুগও তেমনি সত্য। এইদেশে আমি জন্মেছি।

আর কোনো দেশে জন্মাইনি। তেমনি, এইযুগে আমি জন্মেছি। আর কোনো যুগে জন্মাইনি। যুগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যুগের মর্মকথাও আমি ব্যক্ত করে যাব। যেমন দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশের মর্মকথা। এটাও আমার উপর আমার জীবনদেবতার নির্দেশ। দেশের উত্তরাধিকারের মতো যুগের উত্তরাধিকারও আমি মহামূল্য মনে করি। তাই টলস্টয়, চেখভ, রম্যা রলাঁ, বার্নার্ড শ', বারট্রাণ্ড রাসেল আমার কাছে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের মতো আপনার। বাল্যকাল থেকেই আমি যুগসচেতন। আমি যে বিংশ শতাব্দীর সন্তান এ নিয়ে আমি বেশ গর্ব বোধ করতুম। প্রথম মহাযুদ্ধও আমার সে গর্বকে টলাতে পারে না, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাকে লজ্জায় ম্রিয়মাণ করে।

গত পাঁচ শতাব্দীর আধুনিক যুগ পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে তা তো সকলেই প্রত্যক্ষ করছে। সর্বমানবের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই অগ্রগতি। কিন্তু আমার এক ইংরেজ বন্ধু অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, "অগ্রগতিটা কিসের অভিমুখে? পাটনা কলেজ থেকে গঙ্গার গর্ভের অভিমুখে ধাবিত হওয়াও তো অগ্রগতি। তা যদি কর তবে তুমি তলিয়ে যাবে।" যুক্তিটা সে বয়সে আমার মনে ধরেনি। কিন্তু বাহান্ন বছর পরে এখন আমারও সেই একই যুক্তি। অগ্রগতিটা কিসের অভিমুখে! সভ্যতা যদি ধ্বংসের অভিমুখেই ধাবিত হয়ে থাকে তবে আমরা যারা এই ধাবমান জেট প্লেনের আরোহী হয়ে বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হয়েছি তাদের পরিণাম ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের নিয়তি নির্ভর করছে পাইলটের উপরে। পাইলট কি অভ্রান্ত? আর পাইলটও অসহায়, যদি ইনজিন ফেল করে বা হঠাৎ আগুন ধরে যায়।

বুদ্ধিজীবীদের কাছে সকলেই প্রত্যাশা করে মুশকিল আসান। কোথাও কিছু বিগড়ে গেলে লোকে বলে, "বুদ্ধিজীবীরা নীরব কেন! নিষ্ক্রিয় কেন!" কিন্তু একালের সমস্যাগুলো এমন জটিল যে জট খুলতে না পারলে শুধুমাত্র হাত লাগিয়ে আমরা কে কী করতে পারি? জেট প্লেনে যদি আগুন ধরে যায় তবে যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা সেরা বুদ্ধিজীবী তাঁরা অভ্রভেদী চিৎকার করে বা আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ কিছু সুফল দেখাতে পারবেন না। যা হবার তা হবেই। গত দুই মহাযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা দেখে বিশ্বাস হয় না যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা আরো গৌরবের হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে। আমরা বড়ো জোর আশা করতে পারি যে বাধবে না। কিন্তু আশা করা ও নিশ্চিত হওয়া কি এক? তা বলে একেবারে হাত গুটিয়ে চুপ করে থাকা যায়

না। সেটা মানুষের মতো কাজ নয়। মানুষ ভাববে, বলবে, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। কে জানে জট হয়তো খুলে যাবে। এটা শুধু বুদ্ধিজীবীদের নয়, মানুষ মাত্রেই কর্তব্য।

এটা কেবল যুদ্ধের যুগ নয়, বিপ্লবেরও যুগ। কেউ বলতে পারে না কোথায় কবে বিপ্লব ঘটবে। যাঁদের মতে ওটা ঘটাই বাঞ্ছনীয় তাঁদের আমি বলব, ঘটলে যেন বিনা রক্তপাতে ঘটে। তাঁরা হেসে উড়িয়ে দেবেন, জানি। তবু আমার বক্তব্য ও ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যাঁদের মতে ওটা ঘটাই উচিত নয়, তাঁদের আমি বলব, তা হলে আপনারা বিপ্লবের বিকল্প খুঁজে বার করুন। যাতে সত্যিকার পরিবর্তন ঘটে। বিনা পরিবর্তনে বিপ্লবের গতি রোধ করা যাবে না। আর সেটা যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তবে হিংসা প্রতিহিংসাকেই বা রোধ করবে কে?

[গত ১৮ই মার্চ অন্নদাশঙ্কর রায় ৭৫ বছরে পদার্পণ করলেন। এই উপলক্ষে "সংস্কৃতি পরিক্রমা" পত্রিকার কর্তৃপক্ষ গান্ধী মেমোরিয়াল হলে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নতুন এই রচনাটি সেই অনুষ্ঠানে পঠিত। মুদ্রণে অনুমতি দানের জন্য অন্নদাশঙ্কর রায় ও সংস্কৃতি পরিক্রমা সম্পাদক অমূল্য চক্রবর্তীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।]

কবিতাগুচ্ছ

স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতা

প্রণব নাগ

যে কবি দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লেখেন, পাঠকের হয়তো-বা কবির নিজেরও অলক্ষ্যে তাঁর কাব্যের একটা অবয়ব গড়ে ওঠে। ঐ বর্ণ-রূপ-রেখা সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতার তালিকা দীর্ঘ নয়। কিন্তু কবিতার ঘনিষ্ঠ পাঠকের কাছে তিনি অপ্রতিরোধ্য। উপলহীন স্নিগ্ধ সমতল ভূমিতে বিচরণ করতে যারা উৎসুক স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতা তাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে না। তাঁর কবিতা পাঠককে অনুভূতির খাড়া পাহাড়ে নিয়ে যায়। অবশ্য কাছাকাছি কোথাও অধিত্যকা আছে, স্রোতস্বিনী নদী আছে, নিবিড় ঘন অরণ্য আছে। খুঁজে পাওয়াও দুঃসাধ্য নয়।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য একবার লিখেছেন, কবিতার কাছেই জীবনের নিরাময় চেয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। গভীর কোন অসুখ বুকে নিয়ে তিনি কবিতার কাছে শুশ্রূষা ও আরোগ্য কামনা করেছেন। নিজের সম্পর্কে আরো লিখেছেন তিনি, "ফুটবলে দুর্দ্ধর্ষ গোলকিপার, গ্রামের আদর্শবাদী শিক্ষক, মফঃস্বল শহরের ভীতি উৎপাদনকারী এক নম্বর প্রতিপত্তিশালী যুবক (মস্তান!) ইংরেজ রাজত্বের ভিৎ-কাঁপানো ফেরারী রাজনৈতিক কর্মী, এঞ্জিন ড্রাইভার, জ্বালাময়ী সম্পাদক—বাল্য ও কৈশোরে এমনি কত কিছু হতে চাওয়ার ভগ্নস্তূপ আড়াল করে আছে আজকের আত্মপরিচয়।"

কিন্তু হতে চাওয়া ও ইচ্ছের জড়গুলি বড় নাছোড়বান্দা। পরিণত বয়সেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

'সূর্যকে বলের মত লুফে খেলা শেষে

বালকের মত ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে
দরোজা থেকেই মাকে ডেকে বলি, ছাখো
বাড়িতে ফিরেছি সন্ধ্যা হতে-না-হতেই,
বহুদূরে পাহাড়ের গভীর কাননে সারারাত
পুরুষ হাতির মতো উন্মত্ত মরণপণ লড়াই-এর পর
বাঞ্ছিত নারীকে জিতি,
অভিমন্যু-ঘাতকবৃন্দকে
রাগায় কলার চেপে তাদেরও রক্তের কিছু অপব্যবহার করি, আর
আকাশে দেবতাদের নক্ষত্র বাঁধানো ঘাটে হাত ধুয়ে মুছে
জলে নামি, ডুব দিয়ে অমরত্ব পাই।' [ইচ্ছে তো অনেক]

কবি নিজেই সবচেয়ে ভাল জানেন এই ইচ্ছেগুলি আসলে অসাড় ও শিথিল দিবাস্বপ্ন। কোন সংকল্পই তিনি যথাযথ পালন করতে পারেন না। প্রেমিকার কাছ থেকে তিনি ভীরুর মত পলাতক। সমস্ত ঝুঁকি থেকে আত্মরক্ষা করে তিনি প্রাত্যহিক হীনকর্মে লিপ্ত।

আবার একদিন অস্তগামী সূর্যের করুণ আভায় পথের ধারে গাছের ছায়ায় এক নিহত কিশোরের গায়ে হাত দিয়ে তিনি সচকিত হয়ে ওঠেন।

'মনে হয় অবিকল এমন আদল
কোথায় দেখেছি, কবে, বহুদিন আগে?
ভয়ে ঘাম ছোটে, দ্রুত হাতে
কার এই শবের যমজ বুকে নিয়ে
বন্দির শহরে আমি প্রচণ্ড চিৎকার করে বলেছি—আমি যে
একাকী। কে আছো?
আমাকে সাহায্য করো মৃতের যথার্থ সংকারে।'
[ক্রমশ নিমজ্জমান]

এই মৃত কিশোর কি কবির অতিক্রান্ত কৈশোর কাল? শবের যমজ যদি ঐ কিশোর, তবে শব কে? তবে কি কবির নিজস্ব অস্তিত্ব এখন শবতুল্য? নিজেকে ভালো করে বোঝার জন্যেই দ্বিধা-বিভক্ত নিজেকে দেখার এই চেষ্টা। নিজের যমজ রূপকল্পনার তাৎপর্য বোধহয় নিজস্ব সত্তার বোধাতিরিক্ত এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সামঞ্জস্য ঘটিয়ে পূর্ণতর আত্মোপলব্ধির সামিল হওয়া। এই রকম কোন এক চরম মুহূর্তে কবি অনুভব করেন—

'কে যেন
নীরবে এসে ক্রোধে কাঁপা হাতের ঝটকায়
ছুরি খোলে, ধীরে সুস্থে কাটে বুকে শব্দের সিঙ্কাই।'

কবিতা সৃষ্টির নিজস্ব প্রক্রিয়াটি তিনি মৌলিকভাবে ব্যক্ত করেছেন।

স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতায় ভাবালুতা নেই। কিন্তু জটিলতা আছে। বলা বাহুল্য, এই জটিলতা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য। সম্প্রতি তিনি কিছু গীতধর্মী কবিতা লিখেছেন। শুধু সৌকর্যই এই পর্যায়ের কবিতাগুলির একমাত্র লক্ষণ নয়। সম্ভবত এইসব কবিতা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

'তুমি যে আমার চোখের চন্দ্রাতপে
খানিক বসেছ! গলে যায় যত ক্ষোভ।
ঘামে ভিজে ওঠা আঙুলের আকুলতা
তোমার মুঠিতে খুঁজে ফেরে শেষ কথা।' [ভালবাসা এসে]

সাধারণত স্নেহাকরের কবিতায় প্রকৃতির সংস্পর্শ খুব বেশী নেই। এই কবিতাগুলির মধ্যে নিসর্গ চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

'হাতে হাত রেখে তোমার দু'চোখ পূজোর আকাশ হলে
ব্যগ্র বাহুতে বেঁপে উঠেছিল শেফালির নত শাখা,
মেঘ আমাদের দিয়েছিল তাঁর রত্ন সিংহাসন—
সকলই স্বপ্ন ভালো মনে নেই মার্দুর্য বুকে আছে।
ঋতু বদলায়। শুধু আজও অন্তরে
খুব ভোর বেলা স্মৃতি ও শেফালি ঝরে।
[হাতে হাত রেখে]

স্নেহাকরের কবিতায় প্রেম একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। আবার এই ভালোবাসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে বিবিক্ত ও বিচ্ছিন্ন এক নির্মোহ সত্তা যা ক্লান্তি ও ঘৃণায় নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা ও বিমুখতার দ্বন্দ্বে কবি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন জীবনের বিষণ্ণ দ্বৈত ভূমিকায়।

'ঈশ্বর আমাকে কেন জীবনে দ্বৈত-ভূমিকা দিয়েছ
ঘিলু ও হৃদয় যেন দুটি ঘোড়া দুই দিকে ছুটে
কোথাও যায় না শুধু অন্ধকারে ছিঁড়ে যেতে চায় যে আমাকে।'

কবি নিরাবেগ নন, নিরাকৃতও নন কিন্তু অক্রিয়।

'কেননা একদা শিশু-প্রেমের গলায়

নীল দাগ দেখে,তার বিস্মিত চোখের রক্তে অস্ফুট ধিক্কারে,
উন্মাদ আতঙ্ক নিয়ে ফিরেছি আমার ঘরে নিজস্ব নরকে।'

কিন্তু নিজস্ব নরকে গিয়েও তাঁর মুক্তি নেই। যান্ত্রিক নিয়মে সঠিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া আর সম্ভব নয়। কারণ ঘৃণা ও প্রীতি নিয়ে তাঁকে:

'দাঁড়িয়ে থাকতে হবে চিরদিন দ্বিধান্বিত—সকলের তরে
যেহেতু আমার
এক করতলে ঘৃণা, অন্য করতল জুড়ে পেরেকের প্রাচীন গ্র্যাংগ্রিন।'

'প্রেমের সময় হলো' কবিতায় স্নেহাকর প্রেমানুভূতিকে বহুযুগ বিস্তীর্ণ স্থান ও কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে পেরেছেন। বর্তমান কাল অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র বর্তমান কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্মৃতি ও ঐতিহ্য অতীতকে ধরে রাখে এবং আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে প্রসারিত। প্রেমের তাৎক্ষণিকতা এই কবিতায় অসামান্য নৈপুণ্যে অতীত ও ভবিষ্যতে অভিক্ষিপ্ত।

প্রেম এখানে সময়ের সঙ্গে গাঁথা একটি রূপক। এই প্রেমের সূচনা হয়েছিল সৃষ্টির আদিম প্রভাতে। বিস্ময় আনন্দ ও বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল নারীর পার্থিব ভালোবাসা সেদিন ছিল দেবগণেরও ঈপ্সিত। এমনি এক অলৌকিক প্রেমই বুঝি দময়ন্তী উপহার দিয়েছিলেন নিষধরাজকে দেবতাদের অনায়াসে উপেক্ষা করে। কিন্তু অন্ধকারের শক্তিগুলির কাছে নশ্বর প্রেমের অব্যাহতি নেই। প্রেমের উত্তরাধিকার বিস্মৃত হতে দেরী হয় না। সব কিছু পণ রেখে হেরে গেলে বিশ্বাসও হারিয়ে যায়। তাই প্রেমের রাজকন্যাকে ফিরে যেতে হয় ট্রামের ইস্পাত রেখা ধরে সম্রাট পিতার কাছে। এই কবিতায় চিত্রকল্পগুলির উপস্থাপনা প্রদীপের মত উজ্জ্বল, স্বাভাবিক, পরিমিত ও স্নিগ্ধ যেন কীটস কথিত luxury of twilight!

'তারার মুকুট পরা অভিষিক্ত রাত / আনন্দ সওয়ার হলে কালোঘোড়া
কদম ছোটায় / হাতঘড়ি অলক্ষিতে গলে যায় ধীরে।' [প্রেমের সময় হলো]

প্রতীকী ভাষার সাহায্যে এখানে যৌন সম্ভোগ ও চলমান সময় ও পরিবর্তনকে নাটকীয়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'হাত ঘড়ি অলক্ষিতে গলে যায় ধীরে' এই চিত্রকল্পটি সালভাডর ডালির 'দ্যা-পারসিসটেন্স অফ মেমারি' চিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কোন কোন কবিতায় স্যুররিয়ালিস্ট প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। এই ঝোঁক যে তিনি সচেতন অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীল করেছেন তার প্রমাণ আছে। কিন্তু তাঁর ইদানীংকার কবিতায় সম্পূর্ণ

বর্জিত না হলেও স্যুররিয়ালিস্ট প্রতীকগুলি ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে। বিমূর্ত ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্যেই প্রতীক ব্যবহৃত হয়। প্রতীকের সঙ্গে ভাবটির সাদৃশ্য যদি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয় তাহলে প্রতীক ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। স্যুররিয়ালিস্টরা সাধারণত ফ্রয়েডীয় প্রতীকগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। মনে হয় না আঁদ্রে ব্রেটনের 'সাইকিক অটোমেশন' পদ্ধতিতে স্নেহাকর কখনো কবিতা লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি কবিতায় স্যুররিয়ালিস্ট প্রতীকের ব্যবহার অনবদ্য। দু' চারটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

'ঐ যে যজ্ঞের ঘোড়া সুলক্ষণ পবিত্র পেশীর আলোড়নে / ফিরে আসে,
বলীয়ান বাঁকানো গ্রীবায় খেলা করে, / তোমার শ্যামল বেদী-তলে'

*

নিদ্রার ভিতরে নদী, নদীর ভিতরে ক্রীড়া পীড়াহীন বীর্যের স্খলন।'

*

'বিশ্বস্ত সাপের পিঠে অর্জুনের সঙ্গে সারারাত '

*

'ঘুমের ভিতরে প্রাচীন রোমশ ঘড়ি বেজে ওঠে'

'পাতাল-জলের ঝাঁপি' কবিতাটিতে ফ্রয়েডীয় প্রতীক বা স্যুররিয়ালিস্ট চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি। কিন্তু দুর্বোধ্য। মাঝরাতে অতর্কিতে পাতাল-জলের ঝাঁপি খুলে দিয়ে স্নেহাকর পাঠকের বোধবুদ্ধিকে জলমগ্ন করেছেন।

শিশুরা মাতৃস্তন পান করে মায়ের বুকেই গভীর শান্তিতে নিদ্রা যায়। এই ছবিটি কবি যৌনতৃপ্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

'আমি এই অন্ধকারে আমার অস্তিত্বে মুখ গুঁজে শুয়ে আছি আর্ত পিপাসায়,
এক স্তনে ঠোঁট আর অন্য স্তনে হাত রেখে নিদ্রার ভিতরে
শিশুরা যেমন খোঁজে পৃথিবীর সর্বশেষ সুখ।' [আমি এই অন্ধকারে]

বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক যোগাযোগের মাধ্যম দেহ। দেহই একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব। শারীরবৃত্তীয় অভিজ্ঞতা থেকেই জাগতিক স্বার্থ ও বিভিন্ন সংস্রবের সৃষ্টি হয়। এই সীমার মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব। দেহ অস্তিত্ববোধের মূল উৎস হলেও নিছক দৈহিকতা ব্যক্তিসত্তাকে অংশ পীড়িত ও বিকৃত করতে পারে। সমাজ বহির্ভূত মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধ সত্ত্বেও ব্যক্তিমাত্রই স্বতন্ত্র এবং অপরিহার্য গোপনীয়তায় আবদ্ধ। প্রত্যেককেই নিজস্ব অবস্থার শরিক হতে হয় এবং কর্মের দায় দায়িত্ব বহন করতে হয়। সুতরাং

অস্তিত্বের অনুভূতি মূলত ব্যক্তিক। অস্তিত্ববোধের মধ্যে মৌলিক নিঃসঙ্গতা থাকলেও যৌন জীবনে মানুষ একক নয়। যৌনতাকে জৈবিক অথবা মানুষের সত্তা থেকে পৃথক কোন সুখানুভূতির অভিজ্ঞতাও বলা যায় না। বস্তুত যৌন অভিজ্ঞতা অস্তিত্ব বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সামগ্রিকভাবে নিয়ামক শক্তি। পারস্পরিক সম্পর্কে যে টানাপোড়েন থাকে যৌন সংযোগ হলেও সেই দূরত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না। অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমরা প্রত্যেকেই পরস্পরের কাছে অলভ্য। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতা স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতায় এক ভয়ংকর রূপ নিয়েছে যা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

আমি / বাতাস আঁকড়ে ধরে ঝুলে আছি পিঁপড়ে ছেকে-ধরা / অবসন্ন কেঁচোর মতন মাঝে মাঝে / আমার অস্তিত্ব নড়ছে, একা, আমি সঙ্গমেও বিষণ্ণ একাকী / এখন নারীও নয় নক্ষত্রও নয় হা! ঈশ্বর / আমিই আমার দুঃখ, নির্বাসন, বিষাদ-বিষাক্ত ক্ষত, পাপ।' [প্রথমে ভিতরে কিছু ছিঁড়ে যায়]

আমিই আমার দুঃখ, নির্বাসন, ইত্যাদি অভিব্যক্তির মধ্যে কবি নিজস্ব বিষণ্ণতা দুঃখ এবং পাপের জন্যে নিজেকেই দায়ী করেছেন। স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতায় অস্তিত্ববাদের ভাবধারা প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার ঋজুতা লাভ করেছে। তাঁর কবিতায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অবসাদ, বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, বমন, ঈশ্বর, পাপবোধ, আত্মহত্যা ও মৃত্যুইচ্ছার পুনরুক্তি দেখা যায়। সার্ত্র-এর মত স্নেহাকর বোধহয় ভাবেন না যে ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে মানুষই ঈশ্বরের স্থানগ্রহণ করেছে। পৃথিবীর ভার স্কন্ধে বহন না করেও বহুমুখী অনুভূতি সমন্বয়ে কবির অস্তিত্ব ক্লিষ্ট। কামুর কাছে মানুষের অস্তিত্ব নঞর্থক। স্নেহাকর অন্ধকার জনশূন্য প্রান্তরে পিতৃপুরুষ-গণকে আহ্বান করে প্রশ্ন করেছেন, 'কী এমন অপরাধ যার যোগ্য শাস্তি এই দ্বীপান্তরে জীবন যাপন!' খ্রীষ্টিয় পাপবোধের উৎস ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্নতা। সত্তা থেকে বিযুক্ত হওয়াই অস্তিত্ববাদীদের কাছে বিচ্ছিন্নতা বোধ। পাপবোধও জাগতিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বিচ্ছিন্নতা বোধের নামান্তর। সার্ত্র বা কামুর চেয়ে কিয়েরকেগার্ড-এর সঙ্গেই স্নেহাকরের সাদৃশ্য বেশী। কিয়েরকেগার্ড নিজের সম্পর্কে তাঁর জার্নালে লিখেছিলেন, "inwardly torn asunder and without any expectation of leading a happy life."

অস্তিত্বের বৈচিত্র্য নানাভাবে তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। কখনো তিনি চিত্রময় করে তুলেছেন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের ঘৃণা ও অবসাদকে—যে অবসাদ, 'কোন কোন স্ত্রীলোকের পাছার মতোনই খুব ভারী।' জরা আজ বুককে পঙ্গু

করেছে, তিনি সকলের অবাঞ্ছিত, সবাই তাকে তাড়াতে চায়। নিজের হাতে গড়া হলেও সারা সংসারের মুখে, ওষুধপত্রের তাকে, চেয়ারে, টেবিলে তার পেচ্ছাব করে দেবার ইচ্ছে জাগে।

'কলকাতা' স্নেহাকরের কবিতার একটি বিস্ফোরক শক্তি। কলকাতা সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি' বললে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয় না। বরং বলা উচিত কবির বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা নিরন্তর কলকাতার দ্বারা আক্রান্ত। এই নগরের স্কাইলাইন ও চলচ্ছবি তাঁর কবিতায় ইতস্তত ছড়ানো। যথা—

'চারিদিকে অশরীরী ভিড় শব্দ ছায়া / প্রাসাদ প্রাচীর দুর্গ মাস্তুলের
অস্পষ্ট আভাস'

নগরকে সাধারণত নারী ও মাতার প্রতীকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের লেখকরা নগরকে অনেক সময় দেবীরূপেও কল্পনা করেছেন। কলকাতা শত বিরোধ বৈচিত্র্যের মধ্যে তার রহস্যময় শক্তিকে লুকিয়ে রেখেছে। বন্দিনী হলেও 'উচ্ছলতায় কারাগার ভুলে যায়।' কিন্তু সহস্র যন্ত্রণা নিয়ে কলকাতা ভেঙে পড়ছে না। কলকাতা কখনো লাবণ্যময়ী বিষাদ প্রতিমা আবার কখনো রঙ্গিণী অথবা অপরিচিতা কলহাসিনী কিংবা উন্মাদিনী। কলকাতা সম্পর্কে কবির মনোভাব অংশত লণ্ডন সম্পর্কে উইলিয়ম ব্লেক-এর মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয়।

'I wander thro' each charter'd street
Near where the charter'd Thames does flow,
And mark in every face I meet
Marks of weakness, marks of woe.

In every cry of every man
In every infant's cry of fear
In every voice, in every ban
The mind—forg'd manacles I hear.'

[London / William Blake]

'পাতাল-জলের ঝাঁপি' কবিতায় যেখানে 'মহা এক অজগর এঁকেবেঁকে উঠে আসে কলকাতার অসীম প্রান্তরে', 'প্রেম থুতু বমিতে হিংসায় মাখামাখি' সেই কলকাতাকে মনে হয় ভয়ংকর এক প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য। জান্তব কিন্তু যান্ত্রিক নয়। টেকনোলজির প্রভাব স্নেহাকরের কবিতায় অতিপ্রত্যক্ষ নয়। নিষাদ-

কলকাতার লালাঝরা চোখে যৌন অতৃপ্তি। স্নেহাকরকে প্রচলিত অর্থে নাগরিক কবি বলা চলে না। তাঁর কবিতায় যদি আধুনিক নাগরিকতার সমানুভূতি থাকে তবে সেটা যতটা শিল্পযোজিত সমাজের প্রভাবে, তার চেয়েও বেশী অবিস্তার্য আত্মবোধের সংঘাতে। স্নেহাকরের নগরমনস্কতা মূল্যবোধের রূপান্তর বা ঐতিহ্য বিচ্যুতির সঙ্গে সমীকরণীয় নয়। এই সংঘাত সত্তাকে টুকরো টুকরো করে দেয়। অস্তিত্বের ছিন্নভিন্ন অংশগুলি—

'বহুকণ্ঠে কথা বলে তারস্বরে, কী যেন বোঝাতে চায় তবু
একের মিনতি, কারো স্বীকারোক্তি অথবা মার্জনা ভিক্ষা শুনে / অপর
ভগ্নাংশগুলি খলখল বিদ্রূপে হেসে ওঠে।'

এই মরবিডিটি আধুনিক মানুষের নিয়তি। মৃত্যুচিন্তা বারবার কবিকে আবিষ্ট করেছে। সন্ধ্যালোকের দৃশ্যপটে আঁকা মৃত্যুভাবনার একটি অপ্রত্যাশিত চিত্রকল্প :

'গোধূলি সতীর মত শুয়ে আছে গঙ্গার চিতায়'

মৃত্যুচিন্তা মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অর্থ জীবনের সসীমতাকে মেনে নেওয়া। মৃত্যু ইচ্ছার আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত—

'দমকা বাতাসে / কে যেন দুলছে শূন্য কড়িকাঠে' [আমি যে তোমারই জন্যে]
'এই রাত ফুরোবার আগে / চিতার পালঙ্কে শুয়ে কথা হবে কত কথা আছে'
[প্রেম নয়]
আমি আজ / এই শুধু চাই / কাল পূর্ণ হলে যেন মায়ের গন্ধের স্বর্গে নিদ্রা যাই,
শিশুর মতন নিদ্রা যাই।' [সারা দিন জ্বর]

J. M. Synge কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "In these days Poetry is usually a flower of evil or good, but it is the timber of poetry that wears most surely, and there is no timber that has not strong roots among clay and worms. Even if we grant that exalted poetry can be kept successful by itself, the strong things of life are needed in poetry also, to show that what is exalted, or tender is not made by feebler blood. It may almost be said that before verse can be human again, it must learn to be brutal."

স্নেহাকর কবিতার বিষয়বস্তু ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক পরিবেশ থেকে নির্বাচন করেছেন। জীবনের তীব্র গভীর বোধের পাশাপাশি আছে প্রাত্যহিক ঘটনা।

'অফিস ছুটির ট্রামে ঠাসা / যাত্রীদের আলোচনা, জিনিসপত্রের দাম,
দাঁড়াবার ভঙ্গি নিয়ে বচসা কলহ / কাদের ট্যাকসিতে যাওয়া অবশ্য উচিত,
কে যে বেশি ভদ্রলোক / মীমাংসা করতে গিয়ে আস্তিন গুটানো—'

[সব কিছু স্বাভাবিক]

উপকরণের সর্বজনীনতা ও বিস্তৃতি সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে স্নেহাকর কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের মামুলী প্রচ্ছদ আঁকেননি। মানুষের Surface personality (Aurobindo) তাঁর কবিতার বিষয় বহির্ভূত। চরম আকুতি বুকে নিয়ে আত্মিক সংকটের বিয়োগান্ত মুহূর্তে তাঁর মর্মস্পর্শী উচ্চারণ স্মরণীয়।

'আমি বাড়ি যাবো / পৃথিবীর এ খেলা আমার নয় / তোমরা আমার খেলার আসল সাথী নও'

[প্রেম নয়]

স্নেহাকরের কবিতা অত্যন্ত অকপটভাবে আমাদের পীড়া দেয়। কোন্ দুর্মর বেদনায়, অপচয়ে, অপ্রেমে কবির দিনগুলি নষ্ট হয়েছে, রাতগুলি ভ্রষ্ট হয়েছে তা আমরা বুঝি না। আত্মভুক বিষাদ কি ব্যসন? তৃষ্ণা কি অন্ধকার? নদী অথবা নারী? আমরা জানি অন্ধকার একটু একটু করে যায় না। আলো জ্বাললে দপ করে চলে যায়। প্রেম সেই আলো। প্রেমের উদ্দেশ্যেই স্নেহাকরের কবিতার অন্তিম আরতি:

'কি আছে তোমার কাছে বলো / ভালোবাসা? ডাকো তবে ডাকো — / নদী হয়ে সমুদ্রের দিকে / চলে যাই প্রণামের মত!'

এই পত্রিকায় প্রকাশিত স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতাগুচ্ছে কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ধারা অব্যাহত।

'বাংলার অস্তিত্ব ভাষা' কবিতাটি যারা ভাষার মাৎস্যনীতিতে বিশ্বাসী তাদের প্রতি হুঁশিয়ারী পরোয়ানা। এই সময়োচিত সাবধান বাণীর তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হয় না। কেননা মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব ভাষায় স্বপ্রকাশ।

এই কবিতাগুচ্ছের মূল সুর আমাদের অপরিচিত নয়—স্বেদ, রক্ত, হিংসা, পাপ, আঘাত, আত্মহনন, সূক্ষ্ম, স্থূল, পাশবিক ও দিব্যভাবময় অস্তিত্ববোধের ক্ষুরধার পথে কবির নিরন্তর পরিক্রমার অনুলিখন। বেশ্যার নিজস্ব বাঁধা প্রেমিকের মতো

কবি জীবনের অন্ধকারে নিশ্চল, অবরুদ্ধ। কিন্তু সব কিছু দূর ছাই করে এক ফাইল নীট মেরে তিনি যখন দুনিয়ার মজা লুটতে চান তার মর্মান্তিক পরিণতি শুধু বিতৃষ্ণা আর তিক্ত উদ্‌গিরণ। 'জীবন ধারণের সমস্ত ব্যাপারটাই তবে বধ্যভূমিতে মাতলামি!'

অনুভূতির দুঃসহ তুঙ্গভূমি থেকে নেমে আসতে হয়। সেই বিকেল-ব্যাকুলিত প্রান্তরে যেখানে প্রেম পঞ্চদীপের শিখায় জ্বলে ওঠা আলোর অঞ্জলি। যে প্রেম শুধু স্মৃতি—সময়ের কাছে গচ্ছিত স্বপ্ন। এই পৃথিবীতে আগেকার মত কিছুই নেই। তৃণ ও শিশির, সন্ধ্যা ও নক্ষত্র, নদী, নারী এবং প্রাকৃতিক পটভূমি পরিবর্তনশীল। কিন্তু 'পৃথিবীতে আগেকার মতো শুধু রয়ে গেল ভালোবেসে আমার এ-হৃদয়ের ক্ষত।' প্রেম হারানোর এই বেদনা মানবিক। জীবনের রুদ্ররূপের প্রান্তে যদি কোন মানবিক মূল্যবোধ থাকে তবে তা অপ্রেম নয়, প্রেম। স্নেহাকর সেই বোধ জাগাতে পারেন বলেই তিনি আমাদের আশ্বাস ও বিশ্বাসের কবি।

স্নেহাকর ভট্টাচার্যের ছয়টি কবিতা

বাংলার অস্তিত্ব ভাষা

বাংলার অস্তিত্ব ভাষা। বাংলাভাষা ঈশ্বরের বাড়ির ঠিকানা।
আমার বিশ্বাস তিনি নিজের বাটীতে প্রতি শব্দের অন্তরে
প্রচ্ছন্ন আছেন। বাংলাভাষা বা শব্দের অপমানে, ঈশ্বরের
অযুত ভোল্টের ক্রোধ ঝলসে দেবে ভূগোলের সমস্ত শরীর।
—আমি তো বাংলার দেশকালে
অনেক জন্মের পরে প্রণাম শিখলাম, তিনি আমার মাথায়
পা রেখে দিলেন তাঁর
বজ্র ও করুণা, এই কবিতায় জন্মান্তরীণ আশীর্বাদ।

নাইলন সন্ধ্যার জালে

নাইলন সন্ধ্যার জালে ঝলমল রূপালি কলকাতা।
ব্যাঙের ছাতার মতো
সকালে যখন সূর্য আকাশে গজিয়ে ওঠে, এ-জীবন আমি

পুরনো ব্লেডের মতো ক্রমাগত ঘষে
আরও একদিন
কাজ চালাবার মতো ক'রে নিতে চাই।
খালি হাই ওঠে
হাই তুলে
চোখে জল আসে,
কখন যে আচমকা দিনের
অর্ধেক শরীর পড়ে গেছে, বাকি অর্ধেক কেবল
থরথর করে।
আমিও মৃত্যুর কথা ভাবি
জীবনের অর্থ সব ঝরে গেছে বলে
মরণ এবং আত্মহনন হয়তো
এত মূল্যহীন আজ।
শুঁড়িখানা ভালো,
পলায়নপর সৈন্যদলের মতোন
যেসব মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে
ছুটেছে এবং দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখ দেখে
তাদের আলাদা করে চিনতে পারি না।
ভিড় ঠেলে চলি,
শুঁড়িখানাতেও
দু'দণ্ড শান্তিতে মাল খাওয়ার উপায় নেই, যে-শালা আমাকে
মাতাল বলেছে আমি তার···খবরদার
গায়ে হাত দিলে হুলুস্থুল কাণ্ড হবে, মশাই আপনিই তবে
বলুন কে আগে মুখখারাপ করেছে, ঠিক আছে
ঠিক আছে, বেচুদা! সবার জন্যে একটা করে ছোটো।
মাঝে মাঝে ঘাম দিয়ে বুকে ব্যথা হয়
কী যেন মোচড় দ্যায়, আরও কিছু মাল চাই। ঘর বা'র করে
যমুনা যখন তার নতুন খদ্দের নিয়ে ঢোকে
বাইরে চলে আসি
পেচ্ছাপের গন্ধে ভরা বারান্দার কোণে

বেশ্যার নিজস্ব বাঁধা প্রেমিকের মতো আমি অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে থাকি।
দূর ছাই! পরোয়া কীসের, প্রাণে ফুর্তি আছে, আমি তো স্বাধীন
আমিও স্বাধীন!
এক ফাইল নীট মারা যাক,
পৃথিবীতে মজা লুটে নাও
ওয়াক ওয়াক ও···য়াক।

আমি ব্যাধ হয়ে

আমি ব্যাধ হয়ে নিজের অস্তিত্বকে তার গোপন গুহা থেকে
আহত পশুর মতো টানতে টানতে নিয়ে এসেছি,
অনেকদিন পর শেষ হলো
অস্তিত্বের অন্তহীন অনুসরণ। যাক, খুব বেঁচে গেলাম, কেননা
ওদের শর্ত ছিল
আমাকে বাঁচতে হলে নিজের হাতেই···
এবং ওরাও প্রস্তুত।

ছুরিটা হাতে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো
দাঁড়িয়ে আছি। যদিও প্রতিটি দিনের
আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, হিংসা, মৃত্যুর ইচ্ছা, উন্নতি,
আঘাত, বিশ্বাসহীনতা, পাপ ও পতন—সব কিছুতেই
জন্মকালীন বিষ্ঠার গন্ধ লেগে আছে, তবু
ছুরির চূড়ান্ত ব্যবহারের আগে
চোখে জল আসে। ওরা আমাকে অনেকটা মদ
গিলিয়ে দিয়েছে। হাঃ! হাঃ! জীবনধারণের
সমস্ত ব্যাপারটাই তবে বধ্যভূমিতে মাতলামি!
কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ছুরিটা প্রথমে অস্তিত্বের গলায় বিঁধিয়ে
রাখলাম—এই জন্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ,

দ্বিতীয় আঘাত স্বর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা,
তৃতীয়বার···চতুর্থবার···তাহলে নিজেকেই, না - না—
এ তো আমার আত্মার রক্তাক্ত নীরাজনা !

আমি অস্তিত্বের চামড়া ছাড়িয়ে মেলে দিতে যাচ্ছি
উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত,
আর সামান্যতম টান পড়লেই আমি
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবো, এমন
অনুভবসিদ্ধ অস্তিত্বের কথা মানুষকে বলে যেতে চাই,
এবং সেই ভাষা পৃথিবীতে জানে শুধু
মানুষের প্রকৃত
তীব্র নীরবতা অথবা কবিতা।

যে তৃণ আসন পেতে

যে তৃণ আসন পেতে শিশিরের মধুপর্ক রেখেছিল সে তো নেই আগেকার মতো
যে সন্ধ্যা আকাশ থেকে তারার প্রথম তোড়া দিয়েছিল সেতো নেই আগেকার মতো
যে নদী ধ্বনির গীত তুলে বয়েছিল বৃক্ষের চূড়ায় সে তো নেই আগেকার মতো
যে চাঁদ ছড়িয়ে ছিল মুঠো মুঠো মল্লিকা-জ্যোৎস্নার ফুল সে তো নেই আগেকার মতো
যে নারী সেদিন বুকে মুখ রেখে কেঁদেছিল সে আর এলো না কাছে আগেকার মতো
পৃথিবীতে আগেকার মতো শুধু রয়ে গেল ভালোবেসে আমার এ-হৃদয়ের ক্ষত।

বরং ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে

বরং ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে ক্ষতমুখ খুলে মরে যাবো
যদি তুমি ভাবো, ভালোবেসে
আমার যাতনা দিয়ে তোমাকে ব্ল্যাকমেল আমি করেছি কখনো।
এ-জীবনে তোমার প্রেমের প্রয়োজন
তাও তো ফুরালো ! গাঢ় পাপের মতোন
বিষাদে আচ্ছন্ন চোখ তোমাকে চেনে না।
ভালো তো বাসো না তবু আসো—

জানি আমি তোমার হৃদয়ে
সোনার থালায় প্রতিদিন
আমার সকল রক্ত জুঁইয়ের মতোন শুভ্র অন্ন হয়ে যায়।

ভালোবাসা

ভালোবাসা আত্মার বিভূতি।
ভালোবাসা অম্লান অর্চনা ॥
ভালোবাসা উদ্দণ্ড বিকার।
ভালোবাসা রক্তের ভর্ৎসনা ॥

ভালোবাসা পবিত্র উন্মেষ।
ভালোবাসা কিশোরীর স্তন ॥
ভালোবাসা মর্ত্য-মলিনতা।
ভালোবাসা আর্ত সমাপন ॥

ভালোবাসা অলৌকিক তপ।
ভালোবাসা অপর্ণা তাপসী ॥
ভালোবাসা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুধা।
ভালোবাসা লোলুপ রাক্ষসী।

ভালোবাসা তীর্থপরিক্রমা।
ভালোবাসা যোনিতীর্থস্নান ॥
ভালোবাসা মদ্যপের রাত।
ভালোবাসা অস্থান কুস্থান ॥

ভালোবাসা দিব্য মধুপান।
ভালোবাসা পরমায়ুযোগ ॥
ভালোবাসা অশ্রু অবিরল।
ভালোবাসা অশ্রু থেকে রোগ ॥

ভালোবাসা দুরারোগ্য ব্যাধি।
ভালোবাসা অক্ষম অবশ ॥
ভালোবাসা বিশল্যকরণী।
ভালোবাসা সংগ্রামের যশ ॥

ভালোবাসা শুদ্ধ পুরোহিত।
ভালোবাসা হোম উষাকাল॥
ভালোবাসা চিন্তার চিতাগ্নি।
ভালোবাসা নিদ্রায় চণ্ডাল॥

ভালোবাসা নবজাত সুখ।
ভালোবাসা ভবিষ্যৎবাণী॥
ভালোবাসা বিহ্বলতর্পণ।
ভালোবাসা লোভী অগ্রদানী।

ভালোবাসা সৌম্য যুবরাজ।
ভালোবাসা উত্তরাধিকারী॥
ভালোবাসা দুঃখীর সন্তান।
ভালোবাসা পথের ভিখারী॥

ভালোবাসা মুক্তির প্রহর।
ভালোবাসা স্বাভাবিক জয়॥
ভালোবাসা বুকে আপৎকাল।
ভালোবাসা কারাগার ভয়॥

ভালোবাসা অন্ধ বিচারক।
ভালোবাসা সুবিচারকামী॥
ভালোবাসা ফাঁসির জল্লাদ।
ভালোবাসা দণ্ডিত আসামী॥

ভালোবাসা মৃত্তিকার ক্ষমা।
ভালোবাসা সর্বংসহা॥
ভালোবাসা বড়ো অভিমানী;
ভালোবাসা নির্মম আত্মহা॥

ভালোবাসা বীজের বপন।
ভালোবাসা অংকুরিত হাসি॥
ভালোবাসা অপেক্ষার কাল।
ভালোবাসা কাঁধে হাতে চাষী।

ভালোবাসা ভাষার অভাব।
ভালোবাসা মৌনী নতমুখে॥
ভালোবাসা কবিসম্মেলন।
ভালোবাসা বাংলাভাষা বুকে॥

ভালোবাসা নির্মল আকাশ।
ভালোবাসা তাপমাত্রা হ্রাস॥
ভালোবাসা অন্তরে সাইকোন।
ভালোবাসা ভুল পূর্বাভাস॥

ভালোবাসা বাঁধ উচাটন।
ভালোবাসা মারণ প্রক্রিয়া॥
ভালোবাসা শান্তিস্বস্ত্যয়ন।
ভালোবাসা মাঙ্গলিক দিয়া॥

ভালোবাসা ইন্দ্রের আলয়।
ভালোবাসা বনবাসক্লেশ॥
ভালোবাসা হিমে দেহপাত।
ভালোবাসা পাতালপ্রবেশ॥

ভালোবাসা হৃদয়ের ভেলা।
ভালোবাসা অকূল পাথার॥
ভালোবাসা নতুন তরণী।
ভালোবাসা নিত্য পারাপার॥

ভালোবাসা নারকী নিষাদ।
ভালোবাসা শায়ক সহসা॥
ভালোবাসা শ্লোকের বিষাদ।
ভালোবাসা তৃষ্ণার তমসা॥

ভালোবাসা চারটি অক্ষর।
ভালোবাসা দুটিমাত্র কথা॥
ভালোবাসা রামায়ণ গান।
ভালোবাসা ভারতের কথা॥

ভালোবাসা শুধু উন্মোচন।
ভালোবাসা উন্মুক্ত লিপিকা॥
ভালোবাসা মরমীর ধ্যান।
ভালোবাসা শেষ প্রহেলিকা॥

ভালোবাসা তোমার হৃদয়।
ভালোবাসা আমার হৃদয়॥
ভালোবাসা তবু তৃপ্তিহীন।
ভালোবাসা তবুও বিস্ময়॥

ভালোবাসা অনাদৃত নারী।
ভালোবাসা ব্যথাক্লিষ্ট মুখ॥
ভালোবাসা কী যে পাপবোধ।
ভালোবাসা অস্তিত্বে চাবুক॥

ভালোবাসা সন্তাপের কাল।
ভালোবাসা বিশ্বের সিম্ফনি॥
ভালোবাসা তুমি নারী তুমি।
ভালোবাসা প্রেত কণ্ঠধ্বনি॥

ভালোবাসা সাতচিৎ কড়ি।
ভালোবাসা গোলকে গমন॥
ভালোবাসা বিরুদ্ধ নিয়তি।
ভালোবাসা নরকে পতন॥

ভালোবাসা দ্বিতীয়ার চাঁদ।
ভালোবাসা কুঁড়ির উদ্গম॥
ভালোবাসা সৃষ্টির বোধন।
ভালোবাসা শান্তি ধৃতি শম॥

ভালোবাসা পূর্ণ যজ্ঞফল।
ভালোবাসা আত্মার বিকাশ।
ভালোবাসা সবার কুশল।
ভালোবাসা আমার বিনাশ॥

আলোচনা

ভারত-শ্রমজীবী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বরাহনগরের প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপয়িতা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা ১২৮১ সনের বৈশাখ মাস থেকে ভারত-শ্রমজীবী নামে একখানি সুলভ সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। পত্রিকার দাম এক পয়সা, পাঠক মূলত শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণীয়েরা, পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা হয়েছিল অন্যূন পনেরো হাজার। ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ-এর পাতায় পত্রিকার এই পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল।

> ইহা কেবল শিক্ষামূলক পত্রিকা এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল শ্রমিক শ্রেণীর নৈতিক ও শিক্ষার উন্নতির একটি উপায় করিয়া দেওয়া। ইহাতে সহজ ও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত যাহাতে জাগতিক ঘটনা, সাধারণের আকর্ষণীয় বিষয়, দেশীয় শিল্প ও তাহার উৎপাদন, বিজ্ঞানের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি এবং যাঁহাদের জীবনকাহিনী পাঠকদের মনে সদ্ভাব জাগ্রত করিতে পারে এরূপ সংক্ষিপ্ত জীবনী, এবং শ্রমিক, তাহাদের নিয়োগকারীদের বা সমাজের সাধারণ লোককে অধিকতর উপযুক্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার উপযোগী উপদেশ ও পরামর্শ এই পত্রিকায় থাকিত।—মূল ইংরেজী থেকে সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত।

১৮৭৪ এর মে মাস থেকে শুরু পত্রিকার এই বিবরণ ১১ ডিসেম্বর ১৮৭৩-এর ডেইলি নিউজে কী করে বেরোলো? হয়তো কোথাও কিছু প্রমাদ হয়েছে।

শশিপদ কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী ছিলেন, তাঁর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মধর্ম নিয়েছিলেন, এর জন্য তাঁকে পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু পিতৃগৃহ ছেড়ে শশিপদ অচিরেই সমাজের, ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার আন্দোলনসমূহের

শরণীয় অংশী হয়ে ওঠেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি, শ্রমিক কল্যাণ, মাদক নিরোধ, সুলভ পত্রিকা—এর প্রত্যেকটিই ইংলণ্ড-প্রত্যাগত কেশবচন্দ্রের আন্দোলন প্রকল্প-ভুক্ত ছিল, শশিপদও এই পর্যায়ক্রমেই তাঁর সেবাব্রত আচরণ করতে প্রবৃত্ত হন। ১৯ মার্চ ১৮৬৫ তারিখে বয়স্ক মহিলাদের জন্য তাঁর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, ১ নভেম্বর ১৮৬৬ তিনি বরানগরে এক শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত করেন, ১৮৭০ এর গোড়ায় স্থানীয় চটকল শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, ১ অগস্ট ১৮৭০ এ স্থাপন করেন 'ভারতবর্ষে সম্ভবত প্রথম' শ্রমজীবী সমিতি। এই ১৮৭০এই শশিপদ নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের অর্থ ও চরিত্রাপচয় রোধ করতে স্থানীয় সুরাপান নিবারণী সভা এবং স্বল্পসঞ্চয়ের প্রবর্তনা দিতে আনা ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁর সুপারিশে খোলা হয় বরানগরের সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্ক। কিন্তু ৪ঠা নভেম্বর ১৮৭১ তারিখে স্থাপিত ব্যাঙ্কের দ্বারোদ্ঘাটন বিবরণ ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার ১৮৭১এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত হল কী করে? ভারত-শ্রমজীবীর অনেক দিন পরের এক সংখ্যায়ও 'ধনী হওয়ার সহজ উপায়' শীর্ষক স্তম্ভে দিন মাত্র এক পয়সা জমিয়ে দশ বছরে ১২৫ টাকার বেশী সঞ্চয় করার সহজ সঙ্কেত দেখানো হয়েছে: 'ইহাকে বিনা পরিশ্রমে বড়লো হওয়া বলিলেও হয়।' বড়লোক হওয়া তো নয়, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া। কিন্তু দুটি যে পরস্পর সম্পৃক্ত এই সমাজতত্ত্বটুকু বক্তব্য ছিল ভারত-শ্রমজীবীর।

মেরী কার্পেণ্টারের আমন্ত্রণে ১৯ এপ্রিল ১৮৭১ শশিপদ সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর আগ্রহ ছিল বিলিতি শ্রমজীবীদের অবস্থা জানা, পর্যবেক্ষণ করা। মেরী কার্পেণ্টারকে তিনি লিখেছিলেন—

> ইংলণ্ডের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা দেখে সেখানকার সংগঠন থেকে শিখতে চাই। কারণ দেশে ফিরে এসে যাতে শ্রমিকশ্রেণীর কিছু কল্যাণ সাধন করতে পারি। – অ্যালবিয়ন ব্যানার্জির ইংরেজি বই থেকে সম্পাদক কর্তৃক অনুবাদ।

বিলেতের শ্রমিকদের পরিস্থিতি তিনি সরেজমিনে দেখেছেন, ভারতীয় শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা বিলেতের বিভিন্ন সভায় বিবৃত করেছেন, এখানকার জন্য ও দেশি কারখানা-আইন চালু করার দাবি জানিয়েছেন। আর, দেশে ফিরে শশিপদ প্রধানত শ্রমিককল্যাণেই আত্মনিয়োগ করেছেন। শ্রমিকদের উপর পুলিশী পীড়ন বন্ধ করতে, তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতা বিস্তার করতে, তাদের নৈতিক-আর্থিক উন্নয়ন করতে, তাদের আত্মমর্যাদাবান করে তুলতে, তাদের

ভ্রমণবিনোদনের স্বাদ দিতে, সর্বোপরি শ্রমিক-মালিকের মধ্যস্থতা করতে, তিনি সদাসক্রিয় থেকেছেন। ভারত-শ্রমজীবীর আগে 'অন্তঃপুর' নামেও তিনি একটি অন্তঃপুরিকাদের কাগজ বের করেছিলেন, ভারত-শ্রমজীবীর পরেও পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রসার-প্রবর্ধন করেছিলেন। তবু নারীকল্যাণের তুলনায় শ্রমিককল্যাণেই তাঁর কৃতি ও প্রভাব অধিক বিস্তৃত হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাক্রমে কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত কারিগরী বিদ্যালয় বা সুলভ সমাচারের প্রসার শশিপদ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। কিন্তু 'ভারত সংস্কার সভা' পৃ ৫, না 'ভারত সংস্কারক সভা' পৃ ৬, পৃ ৭? বোর্নিয়ো কোম্পানির ম্যানেজার শ্রমিকদের কাজের যোগ্যতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যারা সব থেকে যোগ্য শ্রমিক তারা সবাই শশিপদবাবুর লোক। 'আমরা আপনাকে পিতার ন্যায় সম্মান করি'—এই বলে বরানগরবাসী শ্রমিকরাও সংবর্ধিত করেছিলেন তাঁকে। আবার, প্রায় দশক জোড়া যৌথ চেষ্টায় সুলভ সমাচারের প্রচার যে ক্ষেত্রে দাঁড়ায় সাড়ে পাঁচ হাজার: দি হিস্টরি অব বেঙ্গল ১৭৫৭-১৯০৫এ বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ 'দি প্রেস ইন বেঙ্গল', বা আট হাজার: শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য অনুযায়ী পৃ ৬, সেখানে ভারত-শ্রমজীবীর নাগাল অন্তত দু-গুণ। কতদিনে? অবশ্য সুলভ সমাচার মাসিক নয়, সাপ্তাহিক পত্র। তবু এতখানি তাঁর প্রভাব-বিস্তার সম্ভব হয়েছিল বোধ করি অনন্যলক্ষ্য হওয়ার ফলে।

'বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীদেরই সামাজিক অবস্থার সম্যক' পরিচয়ার্থে যে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রথম-দ্বিতীয় বছরের কার্যাবলীতে শশিপদ সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন: দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'বঙ্গ সংস্কৃতির কথা'। কিন্তু সকল শ্রেণীর থেকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি একটি শ্রেণী—শ্রমিক শ্রেণীর, মেহনতী মানুষের উন্নয়ন-সূচী, এবং কানাইলালবাবু বিচার করে দেখিয়েছেন, সমকালীন ব্রাহ্ম সংস্কার-আন্দোলনকারীদের মধ্যে 'শ্রমজীবীদের উন্নতির জন্য সমধিক কৃতিত্ব তাঁরই।' আর এই দিক দিয়ে তাঁর প্রচেষ্টা সমকাল থেকে খানিকটা ভাবীকালের ইতিহাসেও এগিয়ে গেছে। কানাইলালবাবু অনুমান করেছেন, কলকাতায় প্রথম শ্রমিক আন্তর্জাতিকের শাখা খোলার অনুমতি প্রার্থনা করে বিলেতের ইস্টার্ন পোস্ট পত্রিকায় যে আবেদনপত্র গিয়েছিল, শশিপদর পক্ষেই তা লেখা সবচেয়ে স্বাভাবিক। শশিপদর প্রবণতা অনুগতি ও কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করে কেশবচন্দ্রের চেয়ে এটি তাঁরই কার্যসূচী ভুক্ত বলে মনে হয়। সব দিক বিবেচনা করে কানাইলালবাবু দুটি

প্রতিধানযোগ্য সিদ্ধান্ত করেছেন : ১. ব্রাহ্মসমাজ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে সমাজসেবামূলক কাজ শুরু করেছিলেন তা পরবর্তী অধ্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহই নেই। ২ এতে বোধহয় কোনো সন্দেহই নেই যে শশিপদ বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং ভারত-শ্রমজীবী এ দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সপক্ষে অন্যতম প্রথম মুখপত্র।

২

ভারত-শ্রমজীবী কত দিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল? সম্পাদক মহাশয় একবার বলেছেন 'দীর্ঘদিন' (ঋণ স্বীকার), একবার বলেছেন 'বেশ কয়েক বছর' (ভূমিকা, চার-)। অর্থাৎ এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল নির্ণয় করা যায় নি। পনেরো হাজার হয়েছিল এর মুদ্রণ সংখ্যা। অথচ 'দীর্ঘদিন চেষ্টা সত্ত্বেও এই পত্রিকার কোনো কপি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সম্পাদক বিভিন্ন জেলা ঘুরে অতি কষ্টে সিলেট ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার থেকে এক বৎসরের (১৮৭৯) 'ভারত-শ্রমজীবী'র সব সংখ্যাগুলি আবিষ্কার করেছেন।' এই বই সেই এক বছরের পত্রিকার সঙ্কলন।

তা হলে, দুটি অনুমান মনে হয়, ততখানি রক্ষণযোগ্য পাঠ্য কি এই কাগজে ছিল না? নাকি যাদের জন্য শুধু তাদেরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে কাগজ? শ্রমজীবীদের বাইরে ছাপা বইয়ের জগতে ঢুকেছে কদাচিৎ? এতখানি নিশ্চয় নয়। হয়তো এর পরের সন্ধানে আরো হদিশ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।*

তার কারণ কেবল উচ্চ চিন্তা বা গাঢ় রচনাগুণেই যে কাগজ রক্ষা পায় তা নয়, ঐতিহাসিক গুরুত্বও একটি বড় হেতু। সেদিক দিয়ে, যত স্বল্প অধিকারী

* 'দীর্ঘদিন চেষ্টা সত্ত্বেও এই পত্রিকার কোনো কপি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সম্পাদক বিভিন্ন জেলা ঘুরে অতি কষ্টে সিলেট ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার থেকে এক বৎসরের (১৮৭৯) 'ভারত-শ্রমজীবী'র সব সংখ্যাগুলি আবিষ্কার করেছেন।'—সম্পাদকের এই উক্তিটুকু একটু বিভ্রান্তিজনক। তা হলে শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশের সংগ্রহ থেকে ভারত শ্রমজীবী ৬ষ্ঠ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যার (১২৮৬ সাল আশ্বিন) প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ফটোটি তাঁরই বইয়ের মুখপাতে কিভাবে ছাপতে পারলেন? শ্রীপুলিনবিহারী সেন তাঁর 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী'তে 'রবিছায়ার একটি গান "হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর" ভারত শ্রমজীবী পত্রের ফাল্গুন ১২৯২ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল' বলে উল্লেখ করেছেন। 'রবিছায়া'র বিবিধ পর্যায়ের ৭১ সংখ্যক গান এটি। এই তথ্য তাঁকে জানিয়েছেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ ও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। আশা করা যায় তাঁদের বিবরণও কাছের সূত্র থেকেই আহৃত।

পাঠকের কাগজই হোক, ভারত-শ্রমজীবীর স্মরণীয়তা অবিসংবাদী। এই ঐতিহাসিক গুরুত্বটুকু অনুভূত না হলে সম্পাদক মহাশয়ও এত শ্রম স্বীকার করে পত্রিকা সন্ধানকাজে ব্রতী হতেন না।

এক বছর বেশি নয়, তবু এক বছর দিয়েই কাগজের সীমা-সরহদ্দ বেশ বোঝা যায়। সুলভ সচিত্র পত্রিকা, উনিশ শতকী বিদগ্ধ পত্রপর্যায়ের উল্টো পিঠ, তবু আগাগোড়া ব্যবহারিক, বয়স্কশিক্ষণের যে শৈলিটি, তাতে এর আলাদা নিজত্বটুকু আছে। সবই আছে এই ধরনের কাগজে যা থাকে—আখ্যান উদাহরণযোগে নীতিশিক্ষা, সেই আহরণী সাহেবদেশেরও বটে, প্রথাবিহিত। তবু তার পাশে পাশে এই যে সব বিশেষ রচনা—বিশদ উদ্ভিদ বিবরণ, তিনফসলি ধানের বিবরণ, রিয়া আঁশের তিসি আঁশের অজানিত সম্ভাবনার কথা, কার্পাস চাষের ব্যবস্থাপত্র, আখের চিনির তুলনায় খেজুরিয়া চিনির অধিক লাভের দৃষ্টান্ত, বঙ্গদেশের কৃষকদিগের বর্তমান অবস্থা ও ভাবী উন্নতির উপায়, আত্মনির্ভরতা ও স্বল্পসঞ্চয়ের পরিকল্পনা, অস্বাস্থ্য ও নানা প্রকার কুসংস্কার নিরাকরণের প্রসঙ্গ—প্রায় 'রহস্য সন্দর্ভে'র রূপকথার ভাষায় অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়; অথবা এই যে সব সম্পাদকীয় উপদেশ-আবেদন :

১ প্রিয়তম শ্রমজীবীগণ!···মনুষ্য সকলেই সমান। রাজাকে যে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকেও সেই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ছোট বড় সকলেই এক ঈশ্বরের পুত্র। তবে তোমাদের দিন কান্দিয়া কাটাও কেন, বড়লোকে এত সুখ ভোগ করে কেন?—পৌষ ১২৮৬।

২ এক গুণ শস্য রুয়ে শতগুণ পাই,
তবে কেন পরাধীন হয়ে লাথি খাই।
—কার্তিক ১২৮৬।

৩ ভাই শ্রমজীবীগণ, যদি তোমরা সুখী হইতে চাও তবে তোমরা নিজেরাই ভালো হইবার চেষ্টা কর।···দেশের বিদ্বান কিংবা বড়লোকদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিও না।—আশ্বিন ১২৮৬।

৪ প্রিয়তম শ্রমজীবীগণ,···দেশের শুভাশুভ তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে, তোমরা সাহসী হও, স্বাধীনতাপ্রিয় হও, পরিশ্রমী হও, নিজে সুখী হইবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।—বৈশাখ ১২৮৬।

—আর কোথায় পাওয়া যাবে এই বিরল অভিভাবকতা, এই ভাবে, সমসাময়িক কালের শুধু কারখানা-শ্রমিক নয়, 'এই মাসিকপত্র দূরবর্তী গ্রাম্য কৃষকদের নিকটও

যেত।' তা হলে কৃষি আর শিল্পের ভিতভূমি জুড়ে পৌছত এর কথা - সরাসরি : 'প্রকৃত কথা এই, যতদিন আমাদের দেশের শ্রমজীবীগণ উপযুক্ত শিক্ষা না পাইবে, আপনাদিগকে ভালো করিবার চেষ্টা না করিবে, ততদিন'—ততদিন অন্তত তাদের অবস্থার যে কোনো প্রকৃত উন্নয়ন করা যাবে না এই সহজবুদ্ধি থেকে ভারত-শ্রমজীবী চাষীশ্রমীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষসংযোগ করে তাদের মধ্যস্থ মুখাপেক্ষিতা ছেড়ে স্বয়ংসচেতন করে তুলতে চেয়েছিল। এই দায়, বা এই বিশেষ ভূমিকা সমকালীন আর কোনো কাগজের সম্ভবত ছিল না।

বরানগরের বোনিয়ো কোম্পানির চটকলশ্রমিকদের মধ্যে ছিল শশিপদর মুখ্য কর্মক্ষেত্র। তাদের অনেককেই তিনি নিজেদের জাতব্যবসা তাঁত ছেড়ে কারখানায় আত্মনাশ করতে দেখেছিলেন। শুধু আঞ্চলিক নয়, এ হল ব্যাপক সমাজনিয়তির ক্ষুদ্রাংশ, দেশের সমাজপতিস্থানীয়দের কাছেও তিনি এদের সমস্যা নিয়ে দরবার করেছিলেন তাঁর কাগজে : 'তাঁহারা যদি সকলে একত্রিত হইয়া, কোনো বাহিরের লোকের মতো, বিলেত হইতে কল আনিয়া, দেশে নানা জায়গায় কাপড় বুনিবার কারখানা বসান, তাহা হইলে একএকটায় পাঁচ ছয় হাজার তাঁতি জুগী ও জোলা কাপড় বুনিয়া অন্ন জলের সংস্থান করিতে পারে। এরূপ হইলে যে কেবল ইহাদেরই জীবনোপায় হয় এমন নয়, প্রতি বৎসর যে বিলাতের মহাজনেরা বিক্রী করিয়া এ দেশ হইতে রাশি রাশি টাকা লইয়া যাইতেছে, তাহা দেশে থাকিয়া দেশের দরিদ্রতা নাশ করিতে পারে। যদি দেশীয় ধনী মহাশয়েরা এরূপ ব্যবস্থা না করেন, তবে জুগী তাঁতিদের সন্তান সন্ততিগণ পেটের দায়ে অন্য কাজ করিতে যাইয়া ক্রমে ক্রমে কাপড় বোনার কার্য ভুলিয়া যাইবে। এমনকি কেহ আর শিখিবে না। তাহা হইলে কাপড়ের জন্য বিলাত ও অন্যান্য দেশীয় লোকের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।...' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্বে দেশানুরাগ প্রবৃত্তিতে স্বদেশি মিল প্রতিষ্ঠার ঈষৎ আয়োজন অবশ্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে ভিন্ন মুহূর্তের ভিন্ন বিষয়, ইতিহাসবিদ্‌রা বলতে পারেন এই বিকল্প অন্তর্বর্তী আদৌ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কিনা।

ভারত-শ্রমজীবীতে নির্বাচিত সংবাদ বেরোতো, তার অনেকগুলিই এখন কৌতূহলের বিষয়। জার্মানি থেকে এক পত্রপ্রেরক বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নামটি দেখে সাহিত্যপাঠক একটু আত্মীয়তা বোধ করতে পারেন। কলকাতা নর্মাল স্কুলের বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায় নিজের হাতে কাপড় বোনার কল তৈরি করেছিলেন, বা ঢাকায় বাবু দীননাথ সেন ছুতার ও কামারের কাজ শেখার

ইশকুল স্থাপন করেছিলেন, জেনে এখনো ভালো লাগে। এ ছাড়া সংবাদ বেরোতো এই সব : বারাসতের কৃষি মেলার বিবরণ, গঙ্গার পোলের উপর প্রথম বসল বিদ্যুতের আলো, মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুসুরি ডাল খেয়ে সুখ্যাতি, গৌরীপুর গ্রামের উৎকোচপরাঙ্মুখ চৌকিদার, বাবু প্যারিমোহন রায়ের সিমলের বাড়িতে বসেছে চিড়িয়াখানা, পৃথিবীর নানা জায়গার বিচিত্র সব ঘটনা, দেশের বিভিন্ন স্থানের অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মহোৎসবের ঘটনা, তার মধ্যে এই দুটি বুভুক্ষার পাশাপাশি সংবাদ।

১ বিক্রমপুরের অধীন বজ্রযোগিনীতে একজন সতের বৎসর বয়স্ক যুবক ক্ষুধায় কাতর হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ৬/৩

২ সম্প্রতি কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কতকগুলি ক্ষুধাতুর দরিদ্র লোক আগুন লাগাইয়া শহরটি পুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল...৬/৪ যেন রীতিমতো উদ্দেশ্যমূলক। উল্লেখযোগ্য চাকুরি-প্রার্থীদের নিয়ে এই দুটি ভাবনা :

১ বিদেশীয় লোকেরা আমাদের দেশে আসিয়া কারবার করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমরা কি কেবল চাকরির দিকে চাহিয়া থাকিব? ৬/৮

২ কৃষকের পুত্র ক খ শিখিলেই আর লাঙ্গল ধরিতে চায় না, কর্মকারের পুত্র নিজ ব্যবসায় ছাড়িয়া চাকরি করিতে যায়। এরূপ হইলে লেখাপড়া শিক্ষার শুভফলের আশা নাই।—৬/৮

এ কথা যে ১৮৭৯ সালে এ দেশে এই প্রথম বলা হল তা নয়, কিন্তু যাদের সম্বন্ধে এ কথা বহুবার এর আগে বলা হয়েছে সোজা তুলে ধরা হল তাদেরই কাছে। ভারত-শ্রমজীবী সর্বতোচিত্তেই কিছু করতে চেয়েছিল—শ্রমজীবীদের জন্য, প্রত্যক্ষত—হয়তো আজও তার সুফল কিছু আমরা অজানিতে ভোগ করছি।

পূর্বাপর সূত্র সাজিয়ে সম্পাদক কানাইলালবাবু শশিপদর ইতিহাসগত স্থানটুকু নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। বিশদ সুলিখিত তাঁর ভূমিকায় অনতিস্মৃত এই সমাজকর্মীর প্রকৃত ভূমিকা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন—কেবল ব্রাহ্ম সেবাব্রতী হিসেবে নয়, যথার্থ আধুনিক সংস্কর্মী হিসেবে। সে দিক দিয়ে স্বভাবতই এও তাঁর চোখে পড়েছে শশিপদর কার্যকলাপে 'শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মের চেতনা জাগিয়ে তাদের শ্রেণীসচেতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।' ভারত-শ্রমজীবীর এই এক বছরের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় পুনঃপুনঃ এই সাবধান :

১ প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৎসংসর্গে থাকিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকা উচিত এবং সর্বদাই ধর্মনীতির চর্চায় রত থাকা কর্তব্য।—৬/৩

২ পরের মুখ চাহিয়া থাকা অপেক্ষা নিজেরা প্রাণপণ যত্নে সৎ হইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখ শান্তি লাভ করিবে।—৬/৬

৩ দেখিও, সাবধান, মিতাচাররূপ একমাত্র অমূল্যধন যেন আমরা না হারাই, প্রিয়তম শ্রমজীবীগণ সাবধান।—৬/১।

শশিপদ শ্রমজীবীদের মধ্যে এই যে আত্মবিবেকের বল উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন তার কারণ এইটিই সবচেয়ে সনাতন চেনা আরক্ষা, এবং শশিপদ মূলত ব্রাহ্ম ও সেবাব্রতী। শ্রেণীচেতনার সূত্র আমাদের সমাজচিন্তায় ব্যবহৃত হতেও তখনো অনেক দেরি।

কানাইলালবাবুর বিস্তারিত আলোচনা সত্ত্বেও শশিপদর সমগ্রজীবনের অন্তত ধারাবাহিক একটু তথ্যপঞ্জির কৌতূহল থেকেই যায়। আশা করি পরের সংস্করণে এই সংযোজনটুকু পাওয়া যাবে। আর একটি কথা। এমন গুরু একখানি বইয়ের এত অবিশ্বাস্য মুদ্রণ-অশুদ্ধি—মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করে তোলে, নিশ্চয় সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, পরের বারের আগে অবশ্য সে ভুল সেরে নেবার আর উপায় নেই।

ভারত-শ্রমজীবী। অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। দেবালয় ট্রাস্টের পক্ষে দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। ২১০/৩/২ বিধান সরণী, কলকাতা ৬। মূল্য ছয় টাকা।

চিঠিপত্র

সম্পাদক সমীপেষু

শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর "হে সমালোচক" পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া গেল। সুনীলের লেখাটি আত্মপক্ষ সমর্থনের হলেও আগাগোড়া ভাল। তবে একটা জায়গায় আমার খুব হাসি পেল। সুনীল লিখেছেন, 'আমার নিজের গালমন্দ করার অভ্যাস নেই।' এই সুনীলই কিছুকাল আগে লিখেছিলেন না, যে বঙ্কিম বর্তমান হিন্দী সিনেমার কথা মনে রেখে উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন? শুধু সিনেমা নয় হিন্দী সিনেমা। এর চাইতে খারাপ গালমন্দ আর কি হতে পারে! বেচারা বঙ্কিম নেহাৎই পূর্ববর্তী তাই গালমন্দ দিলেও মনে থাকে না। তবে সন্দীপন সম্পর্কে সুনীল যা বলেছেন খুব সত্যি কথা। কিন্তু ঘনিষ্ঠতার দরুন হয়ত সুনীল ওকে লেখক বলে মনে করেন এই যা দুঃখ। সন্দীপন তাঁর ভাষা প্রয়োগে অতি বড় চ্যাংড়া ছেলেদেরও কান কাটতে পারেন সন্দেহ নেই। এবং তাতেই হয়ত তাঁর গৌরব। কিন্তু চ্যাংড়া ছেলেদের কান কাটতে পারলেই ভাষা বা সাহিত্য রচিত হয় না।

সাহিত্য 'নীল সমুদ্রে ক্ষুদ্র প্রবালদ্বীপের বাতিঘর' কিনা জানি না [কল্পনাটি সুন্দর] তবে সৎ-সাহিত্য রচনা যে অতি কঠিন কাজ তাতে সন্দেহ নেই। সন্দীপন তাঁর কানকাটা ভাষায় সেখানে কোনকালে পৌঁছতে পারবেন এমন ভরসা করি না। তবে বর্তমানে সরবে তিনি যা লিখছেন, **তাঁর যতই অসুখ না থাকুক,** তিনি এখনও ক্ষীণকায় [তাই খুব অসুবিধা হবে না] সুতরাং যে ব্যাগ নিয়ে সন্দীপন এত ঈর্ষাকাতর, সেই ব্যাগে ভরে সন্দীপনকে গোলদিঘিতে ফেলে দেওয়াই একমাত্র যুক্তিসংগত কাজ। সমালোচনা বা সাহিত্যরচনা বা ভাষা প্রয়োগে কচি খোকামি করতে সন্দীপনের লজ্জা করা উচিত।

এমন একদিন ছিল যেদিন সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। ধীমান নিত্যপ্রিয়রা সেখানে কোনদিনই পৌছবেন না, তাই বলে নিন্দা সমালোচনা হবে না, সুনীলের এমন আশা করা অনুচিত। নিন্দা করলে সুনীল দুঃখিত হবেন না। নীরব ঔদাসীন্য কিন্তু নিন্দার চাইতে অনেক বেশী কষ্টদায়ক।

নমস্কার সহ

কলকাতা। ১৬. ২. ৭৮ রিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক সমীপেষু,

"হে সমালোচক" সুনীলের বড় সত্যবাদী লেখা। সুনীল সন্দীপের (বোধহয় এই প্রথমবার এবং হয়তো শেষবারও!) পিঠ না চাপড়ে মাথা চাপড়েছেন। এই ধরনের প্রকাশ্য গাঁট্টা দরকার ছিল সুনীলেরই ভাষায় বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের "প্রিন্স" সন্দীপের। আজ প্রায় ফেলে আসা প্রথম প্রেমিকের মতো মনে পড়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজনের রক্ত মাংস' গল্পটিকে। 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বীকেও' লেটার মার্ক দেওয়া চলে। হায় তারপর? দশ লাইন বিশ লাইন বড়জোর এক দেড় পাতা অহেতুক শব্দ ব্যবহার। তাতে মাংস অবশ্যই থাকতো, তবে রক্ত থাকতো না। তা ছাড়া অবিরত নারীশরীরকে এত অপমান, এত ব্যাকডেটেট-ভাবে শরীরের প্রবেশ প্রস্থান দ্বার সমূহের বর্ণনা। হায় একদিন সুনীলই দশ না বিশ বছর পরেরকার বাংলা সাহিত্যকে এই সন্দীপেরই খোঁজ নিতে বলেছিলেন।

তবে সন্দীপের সঙ্গে দীপেন্দ্রকুমার সান্যালের অনেক তফাৎ। দীপেন্দ্রকুমার প্রকাশ্যে যার বিরুদ্ধে লিখতেন, আলাদাভাবে আড়ালে তার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারতেন। বিশেষত সত্যিই যদি প্রতিভা থাকতো সে লেখকের। সন্দীপ উল্টোটা করেন। বন্ধুদের ক্ষেত্রে, অন্যান্য লেখকদের ক্ষেত্রেও। প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করেন, আবার প্রতিষ্ঠানের ডাক পেলেই "একক প্রদর্শনী" সাজান এবং জানিয়ে আসেন "আমার কোন অসুখ" নেই এটা যে একেবারে খারাপ করেছেন তা বলছি না, শুধু আক্ষেপ এই যে এমন একদার সম্ভাবনাপূর্ণ লেখক আমন্ত্রণ পেয়ে যা লিখলেন তা স্থানে স্থানে স্মার্ট গদ্য ছাড়া আর কিছুই হলো না। আর ভবিষ্যতে কোনদিন যে হবে তাও মনে হয় না। তবে গত পনেরো বছর লিখতে না পারার পরও যদি বড় কিছু, সার্থক কিছু, সন্দীপ লিখে উঠতে পারেন তবে বাগানের টাটকা গোলাপ ছিঁড়ে তাঁর গলায় মালা করে দিয়ে আসবো। শুধু

"মিনি মিনি" না করে (মিনি বই, মিনি বিজ্ঞাপন, মিনি গালাগাল) সত্যিকারের ম্যাক্‌সি কিছু করা, অন্তত করার চেষ্টা করা। কেননা ফরাসী লেখকের সেই বিখ্যাত উক্তি তো আমরা জানিই, "তাই মহৎ সাহিত্য, যা বড় কিছু ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়"। কিন্তু শুধু ব্যর্থ হওয়াই মহৎ নয়।

শেষে সুনীলকে করজোড় অনুরোধ, এরকম লেখা ভবিষ্যতে আর লিখবেন না। "সনাতন পাঠকের" কলমে অনেক বন্ধুকেই প্রায়শ এমন ভুল প্রশংসা করেছেন, যাকে "ইমোশনাল এক্সট্যাসি" ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ভুল নিন্দা করা যেমন অন্যায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভুল প্রশংসা আরো সম্ভাবনা নষ্টকারী। আর হ্যাঁ, বামপন্থীরাও লিখতে জানে। মাত্র বিশ ত্রিশ বছর পেছিয়ে যান। রাশিয়ায় পাবেন, ফরাসী দেশে পাবেন, জর্মানীতেও ছিল। এই ভারতবর্ষেও কি ছিল না!

দীপ্ত চক্রবর্তী
বোলপুর : শান্তিনিকেতন
বীরভূম

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার বিগত বিশেষ শরৎ সংখ্যায় (জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭) প্রকাশিত শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "হে সমালোচক" নামধেয় ব্যক্তিগত রচনা প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা! নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা এবং অকপট সংসাহসের জন্য প্রথমেই আমরা লেখককে দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে "ব্যক্তিগত" রচনার শিলমোহরে ছাপা হলেও সমালোচিত সমস্যাটা কি বাঙালীর জাতীয় জীবনের আবহমান অভিশাপ নয়? অভিশাপ এবং সর্বনাশ? রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর থেকে আমাদের সময়ের কোনো মহৎ প্রচেষ্টাকে কি সুনীলবাবুর "সমালোচক" সম্প্রদায় রেহাই দিয়েছেন? কোন্ উত্থানকে তাঁরা সমবেতভাবে দাঁতে ও নখে ফালাফালা করার ষড়যন্ত্র করেন নি?

সুনীলবাবুর অন্তর্ভেদী লক্ষ্য এবং নিহিত সত্যের সঙ্গে আমরা একশোভাগ একমত। কিন্তু অন্তত একটা মারাত্মক অসঙ্গতি এবং তাঁর উপস্থাপিত তথ্যে বেশ কিছু তর্কাতীত ভুল রয়ে গেছে। প্রথমে অসঙ্গতির কথায় আসা যাক্। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সুনীলবাবু তাঁর রচনার নাম দিয়েছেন "হে সমালোচক"! কিন্তু কথা হচ্ছে, উক্ত রচনায় তিনি যে সমস্ত ছদ্মবেশী ঘাতকদের

মহিমা কীর্তন করেছেন—তাঁরা কি সত্যিই অত মূল্যবান অলংকারের অধিকারী? সঙ্কোচ-বিস্তারের ফলে কালপ্রবাহে বাংলাভাষার অনেক শব্দই তাদের অভিধাগত অর্থের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু "সমালোচক" অর্থে স্রেফ "নিন্দুক—নির্ভেজাল নিরেট নিন্দুক" অর্থের মতো নির্মম "হত্যাকারীকে" গ্রহণ করবে কে? সমালোচনা কি প্রকৃত মূল্যায়নের সত্যবদ্ধ প্রতিশ্রুতি নয়? নাঃ, সুনীলবাবুর নামকরণের এই অন্যায় অসঙ্গতি এবং অহেতুক বিনয়কে আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সিংহের চামড়ায় আবৃত হলে শেয়াল কিন্তু সিংহের মর্যাদা পায় না! সুতরাং লেখাটির নাম "হে সমালোচক" না হয়ে "হে নিন্দুক" হওয়া উচিত ছিল।

এবং কিছু কিছু ভুল তথ্য এবং ভুল সত্যও রচনাটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে! বামপন্থী দলে কি কোনো প্রকৃত কবি-সাহিত্যিক নেই? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসুর (কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকাকালীন সমরেশ বসুর সেই অবিস্মরণীয় গল্পগুলির কথা স্মরণ করুন। এবং আজকের সমরেশ বসু কোন্ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি?) নাম সুনীলবাবু ভুলে গেলেন? কিংবা একেবারে হাল আমলের দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবেশ রায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র প্রমুখ বামপন্থী ঘেঁষা কবিদের কথা আর নাই বা করলুম! আসলে ব্যক্তিগত জীবনে ওঁরা যে পন্থীই হোন না কেন—স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সকলেই কিন্তু নির্ভেজাল "শিল্পপন্থী"! শিল্পের কামড় এবং প্রকাশে এই খণ্ডিত বাংলায় ওঁরা নিশ্চয়ই অবশ্যস্বীকার্য প্রতিকৃতি। তবে একথা সত্য, "বামপন্থা"র ভেক্ নিয়ে বেশ কিছু অক্ষম এবং ভণ্ড আমাদের সাহিত্য-শিল্পের জগৎ এবং পারিপার্শ্বিককে প্রতিদিন হত্যা করছে! ওঁরা না "বামপন্থী" না "শিল্পপন্থী"—ওঁরা স্রেফ "প্রতিষ্ঠাপন্থী"! "লাইনে" জায়গা না পেয়ে পোস্টার এবং শ্লোগানের ছায়ায় ভিড়েছেন। তা, এই সব পরগাছা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। সুনীলবাবুর মতো শ্রদ্ধেয় লেখক কেন এত তুচ্ছ ব্যাপারে অতটা উষ্মা প্রকাশ করলেন?

আলোচিত রচনায় সুনীলবাবু দুজন সমালোচকের (?) নাম উল্লেখ করেছেন সরাসরি। নিত্যপ্রিয় ঘোষ সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে পারি না। কেননা, "একা এবং কয়েকজন" নামক উপন্যাস সম্পর্কে "চতুরঙ্গে" ওঁর "গোয়েন্দাগিরি" আমার চোখ পিছলে গেছে। কিন্তু নানান্ বিষয়ে ওঁর বৈদগ্ধ্য এবং রসজ্ঞ জিজ্ঞাসা আমাকে মাঝেমধ্যে আলোড়িত করে। বাকী রইলেন আরেকজন—এক এবং অদ্বিতীয় আরেকজন। হ্যাঁ—আমি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি।

নিন্দা এবং অশ্লীল খিস্তির ক্ষেত্রে ওঁর উজ্জ্বল প্রতিকৃতি বিগত কয়েক বছরে এক অতুলনীয় "প্রতীকে" পরিণত। লেখায় যা প্রকাশিত—তা ওঁর প্রতিভার বিন্দু অংশমাত্র। বস্তুত, সাহিত্যের আড্ডায় তিনি যে কালি এবং কাদা চার্নকের এই প্রাচীন নগরীর বুকে ছড়িয়েছেন—তা'দিয়ে বোধকরি সমগ্র নগরসভ্যতাকে ঢেকে দেওয়া যায়। কিন্তু হায়! শব্দের ব্রহ্মত্ব কবেই উড়ে গেছে!

আমার স্পষ্ট মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে আমার কতিপয় বিক্ষুব্ধ বন্ধু একটি মফঃস্বলী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ওঁর একটি ইণ্টারভিউ-র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্যিই সেদিন তাতে চোখ বুলিয়ে আমি শিউরে উঠেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, (পাঠক! আমি স্মৃতিধর নই। নিদেন অবহেলায় পড়া সেই ইণ্টারভিউ-র আক্ষরিক উদ্ধৃতি দিতে পারছি না। কিন্তু বক্তব্য বিষয়ে একচুল হেরফের নেই) প্রশ্ন ছিল, আপনি আজকাল আর লেখেন না কেন? সঙ্গম-টঙ্গম প্রভৃতি অনেক ধানাই পানাই করে হঠাৎ সন্দীপনবাবু দুম্ করে বলে বসেছিলেন—আমি বুঝতে পেরেছি আমার কিস্যু হয়নি। তাই থেমে গেছি। (অবশ্য, তারপর ফাঁকফোকর পেয়ে সন্দীপনবাবু আনন্দবাজারে একটা উপন্যাস এবং কিছু কিছু বিভাগীয় রচনায় বাঙালীকে ধন্য করেছেন)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাকি সেটা একেবারেই বোঝেননি। ফলে রবীন্দ্রনাথ (হায়! রবীন্দ্রনাথ) বাহি পেচ্ছাপ ত্যাগের মতো আমরণ অনর্গল রচনা করে গেছেন! পাঠক! রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সব কিছু মুছে দিলেও কেবলমাত্র শেষ দশ বছরের রচনার অপ্রতিরোধ্যতা কল্পনা করতে পারেন আজ কোনো জীবিত বাঙালী লেখক? অথচ, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি প্রেমিক বাঙালী সেটা বেমালুম হজম করে গেছেন! হজম না উপেক্ষা?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সম্পর্কে (এই বান্দা সাক্ষী দিতে রাজী আছে। "কথাশিল্পী" সন্দীপনবাবুর মুখ-নিঃসৃত অনেক খিস্তি আজো আমাকে ভীমরুলের হুলের মতো খোঁচায়) ওঁর সবিস্তার বিশ্লেষণ এবং মর্মান্তিক মন্তব্যের প্রসঙ্গ এটা নয় এবং তা করতে গেলে তো প্রায় মহাভারত রচনা করতে হয়। দুঃখ হয়, নিদারুণ দুঃখ হয়। রবীন্দ্রনাথ কথিত "পনের আনা" দলের সশস্ত্র নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় কেন নিতে গেলেন সন্দীপনবাবু? কেন তিনি তিলে তিলে আত্মহত্যা করছেন। অথচ ওঁর "বিজনের রক্তমাংস" তো এখনো আমাদের হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হয়ে আছে! হায় আর আজ? পরাজিতের শেষ আশ্রয় নিন্দা—আক্রোশ এবং ঘৃণা থেকে যার জন্ম।

পারিপার্শ্বিক জীবনকে একটু ভালোবাসলে সন্দীপনবাবুরা বোধহয় পৃথিবীর কিছু মঙ্গল করতে পারেন।

পরিশেষে, সুনীলবাবুর প্রতি সবিনয় জিজ্ঞাসা—তথাকথিত সমালোচক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি আর তাঁর কলম ধরবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন! কিন্তু কেন! ওঁর মতো যোগ্য মানুষ যদি আমাদের জাতীয় জীবনের এই সর্বনাশা বীজাণু বিমুক্ত করতে এগিয়ে না আসেন—তবে আমাদের পরিণাম কী হতে পারে? ভেবে দেখেছেন সুনীলবাবু?

তুলসী মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৩১

মাননীয় সম্পাদক,

'বিভাব' এর শারদীয়া সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'হে সমালোচক' প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানাই। তাঁর সাহসকে অভিনন্দন জানাই যখন দেখি তাঁরই সমসাময়িক এক প্রতিভাশালী লেখকের সাম্প্রতিক লেখনীর সঠিক সমালোচনা করতে সুনীলবাবু একটুকুও কাঁপেন না বরং সব আড়ষ্টতা বর্জন করে সত্যকে তুলে ধরেন। আমরা যারা সাহিত্য ভালবাসি তারা কখনো কখনো লেখকের লেখার পরেও তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা জানতে উৎসুক হই। তাই মাঝে মাঝে নামী লেখকদের সাক্ষাৎকার আমাদের আকর্ষণ করে। প্রসংগটা এই কারণে যে উক্ত লেখকের একটি সাক্ষাৎকার সাপ্তাহিক 'অমৃতে' (১২ই আগস্ট সাহিত্য ও স্বাধীনতা সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। এই সাক্ষাৎকারে একটি বিশেষ অংশ আমাকে বিভ্রান্ত করে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 'একজন লেখকের পেশা কি হওয়া উচিত?' প্রশ্নের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রেখেই উত্তরটার দিকে তাকাই। 'লেখক নিজের মতই পেশা বেছে নেবে। চোর, জুয়াড়ী, দালাল থেকে একজন কেরানীও হতে পারে। তবে মন্ত্রি, সেক্রেটারী, আই, এ, এস, আই, পি, এস, থেকে বড় বড় অফিসার, ডাক্তার, বাংলার অধ্যাপক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।' এখানে এসেই আমি থমকে যাই। ব্যাপারটা যেন প্রথম বক্তব্যকে পরেরটা বেত্রাঘাত করে। আমার হাতে অনেকগুলো নাম ভিড় করে যারা 'বাঞ্ছনীয় নয়' দলভুক্ত অথচ যাদের পরিচয় লেখক হিসাবে উক্ত লেখকের অনেক—অনেক উপরে। এবং তাদের দান বাংলা সাহিত্য কোন দিন ভুলবে না। যদি উক্ত বক্তব্য 'ছুঁচোবাজীর' ভূমিকা পালনে না প্রকাশিত হয় তবে ধরেই নিতে পারি উনি নিজে নিজেকে

এমন প্রকাশ্য বেত্রাঘাত করেননি কখনো। তাই উক্ত উক্তির দিকে তাকিয়েই একটা এলোমেলো মানসিকতা ফুটে উঠে—একজন সৃজনশীল লেখককে হারাতে থাকি এবং বড় বেশী হতাশ হই।

ইতি—
সুতপন চট্টোপাধ্যায়
কোলকাতা-২৫

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রের 'বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যায়' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ব্যক্তিগত রচনা'টি পড়ে দু-একটা কথা মনে হলো বলে এই ছোট্ট চিঠি।

প্রথমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে কিছু মন্তব্য :

এক / ক. ঈর্ষাতুর পুরুষ সমালোচক নন কখনো, তিনি ভদ্রভাষায় ছিদ্রান্বেষী।

খ. ঈর্ষাতুর ছাড়া লেখকের শত্রু থাকার কথা নয়। অতি সাধারণ পাঠকের সঙ্গেও জানি তাঁর অত্যন্ত ভদ্র সম্পর্ক।

দুই / ক. চীনা সাহিত্যের সাম্প্রতিক 'ধর্মবাদ' বা 'গুরুবাদ' তার সাহিত্যকে খুবই খর্ব করেছে।

খ. বাংলায় জাত কম্যুনিস্ট লেখক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধরলেও, আজ পর্যন্ত সঠিক পাওয়া যায় নি। এবং একথা আজ থেকে প্রায় বিশবছর আগেই শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহস করে লিখে ফেলেছিলেন।

তিন / শ্রেণীহীন সমাজগঠনের জন্য যদি বিপ্লব ভারতবর্ষে সত্যিই হয়, সাহিত্যিককে কলম ফেলে রাইফেল বা কোদাল যাই হোক ধরতে হবে বা ধরতে হতে পারে। প্রথমটাই ভালো।

চার / যে সাহিত্যিক যেমন পারেন তিনি তেমনই লিখবেন। কারণ তিনি তার বেশি পারার যোগ্য নন।

লেখকের কিছু কথা ভালো না লাগায় দু-একটি অনুচ্ছেদ :

এক / সমসাময়িক সাহিত্য-বিচারের চেষ্টার অর্থই কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ি নয়। সেটা বরং পরোক্ষে লেখকের মঙ্গল। ব্যক্তিগতভাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে-কবিতায় যুগপৎ নৈপুণ্য আমাকে কতবার অবাক করেছে। আবার ইদানীং কবিতার নির্বাসন ঘটিয়ে গল্প-রচনায় তাঁর অত্যধিক

মনোযোগ আমার অভিমানেরও কারণ। কিন্তু তাঁর বিষয়-আশয়ের শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামানোর থেকে অনেকেই তাঁর লেখার চরিত্রগত বিষয় নিয়ে আলোচনা শ্রেয় মনে করেন। যেমন, তাঁর 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'টি ধরি। লেখাটির পরিণতি সুবুদ্ধিপ্রণোদিত মনে হয়নি। আমার প্রশ্ন আছে, তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতায় 'পব-'কে পেয়েছেন কিনা। যদি পেয়েও থাকেন, যে কোনো যুক্তিতে তাকে ঐভাবে দেখানোর মধ্যে লেখকের চরিত্র বাছাইয়ের মাপকাঠি ঠিক ছিল কিনা।

দুই / যিনি লিখতে পারেন, কোনো পাঠক যদি তাঁর কাছে নতুন কিছু চান তার অর্থ তাঁর কাছে দেশের দারিদ্র্য দূর করার আবদার নয়। দেশের এমনি অবস্থায় অনেক সুন্দর সমাজসচেতন লেখা গড়ে ওঠে। এটাই ইতিহাস। রাশিয়ার বিপ্লবপূর্ব সাহিত্য, চীন-এর বিশ দশকের লু সুনের গল্প, মাও তুনের, যিনি এখন মাও-সে-তুঙ-এর রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের প্রকাশ প্রচার করে কবিতা লেখেন, চল্লিশ দশকের গল্প, একথা মনে পড়িয়ে দেয়। অন্য পরিস্থিতিতে আমেরিকার তিরিশ দশকে হেনরি রথ বা সত্তর দশকের জেমস বল্ডউইনের কথাও স্মরণে আসে।

শেষ / একশো সাত কিস্তির উপন্যাসের প্রথম তিন কিস্তি নিয়েই যাঁরা সমগ্র আলোচনা ফাঁদেন তেমনি করকোষ্ঠীবিচারকদের বিরুদ্ধে তাঁর উপদেশ দেবার কিছু থাকলে কোনো দৈনিক পত্রিকাই সম্ভবত উৎকৃষ্টতর মাধ্যম ছিল।

পত্রিকাটির সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্নতার জন্য ধন্যবাদ। নমস্কারান্তে ইতি—

রমানাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিগুরু রবীন্দ্র সরণী
ভদ্রেশ্বর। হুগলী

সম্পাদক সমীপেষু,

'বিভাব' বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যায় অনেক ভালো-ভালো রচনা পেয়ে আমরা উপকৃত ও আনন্দিত হয়েছি। সুরুচিপূর্ণ ও পক্ষপাতশূন্য এমন একটি পত্রিকার দরকার ছিল।

'সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা একেলা?' শীর্ষক রচনায় নিত্যপ্রিয় ঘোষ উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে রজনীকান্তের দু' ছত্র তুলে দিয়েছেন—

'মায়ের ঘরে মোটা কাপড় পরলে কেমন সাজে?'

আমাদের কাছে ছত্র-দুটি নতুন ও অচেনা লাগছে। এ কি রজনীকান্তের লেখা? আমাদের যতদূর মনে পড়ে লাইন হচ্ছে—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'

স্মৃতি থেকে লিখলাম যদিও জানি স্মৃতি মিথ্যাচারী। Of all liars the smoothest and most convincing is memory। কিন্তু উক্ত লেখক যে লাইন-দুটি তুলে দিয়েছেন তাও স্মৃতিদুষ্ট নয় তো?

আমাদের উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায় 'বিভাব' বেশ সমাদর পাচ্ছে দেখে আমাদের ভালো লাগছে। 'রবীন্দ্রনাথের বই' শীর্ষক রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এই রচনাটির জন্যে শিশিরকুমার দাশ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আপনারা প্রকাশ করেছেন দেখে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সহজ কথা সহজ করে বলাও বড় কঠিন হয়ে পড়েছে আজকাল। কিন্তু সর্বত্র হয়তো না, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় মুষ্টিমেয় জনা-কয়েকের চক্রান্তে। দুর্জনের সংখ্যা কোনো কালেই বেশি নয়, কিন্তু অল্পলোকই মস্ত দুষ্কর্মের রাজত্ব চালায়।

এই শিশিরকুমার দাশ সম্ভবত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সুযোগ্য অধ্যাপক? তিনি বঙ্গদেশ থেকে দূরে থাকেন। দূরে থাকেন বলেই হয়তো এখানকার হালচাল বড়-বেশি জানেন না। তা যদি জানতেন তা হলে দুষ্টচক্রে লোষ্ট্রপাত হয়তো করতেন না। কিংবা, হয়তো জানেন। এবং জানেন বলেই তার বিরুদ্ধে তাঁর এই সাহসী প্রতিবাদ।

শিশিরবাবু লিখেছেন, "দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের নামে নানা বই প্রকাশ করে চলেছেন। মহাত্মা গান্ধী, বুদ্ধদেব, খৃষ্ট প্রভৃতি বই যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কেউ জানতেন না। রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় জানতেন না।"

অতি সাফ কথা খুবই স্পষ্টভাবে বলেছেন তিনি। দুটি কথা বিশেষ করে পুনরুল্লেখ করতে ইচ্ছে করি। ১ 'বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের নামে নানা বই প্রকাশ করে চলেছেন'—কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। 'রবীন্দ্রনাথের বই' না, **'রবীন্দ্রনাথের নামে বই'**। এসব বইয়ের রচনাগুলি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের, সব রচনা সংগ্রহ করা বা সংকলন করা এক কথা, সেই সব লেখা দুই মলাটের মাঝখানে রেখে মলাটের উপর একটা পছন্দসই (কার পছন্দ?) নাম দিয়ে দিলেই হল? এর কি কোন নিয়ম নেই, নীতি নেই? কী জানি! ২ 'রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় জানতেন না'—আমরা হলফ করে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ

একথাও জানতেন না যে, তাঁর রচনাদি প্রকাশ করার ভার যে গোষ্ঠীর উপর পড়বে তাঁরা নিজেদের আখের গুছাবার জন্যেই, এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণে রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে (সামলে রেখে নয়) অনেক প্রকারের অকাজ-কুকাজ করে যাবেন। শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময়ে অনেক রবীন্দ্রভক্ত নাকি রবীন্দ্রনাথের দাড়ি উপড়ে নিয়েছিল স্মৃতিচিহ্নরূপে তা রাখার জন্যে। সেই কাজটা অতি গর্হিত বলে মনে হয়েছিল। দেহের সঙ্গে ভস্ম হয়ে গিয়েছে দাড়ি, যে অংশ ছিন্ন হয়েছে তাও ভস্মই হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে সৃষ্টি ভস্ম হবার নয়, তার এমন দশা—এমন দুর্দশা—কেন।

শিশিরবাবু তাঁর লেখায় ছিন্নপত্র এবং ছিন্নপত্রাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। সত্যিই, ছিন্নপত্র হচ্ছে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের স্বয়ং নির্বাচিত চিঠির সংকলন। এ'তে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা আটটি চিঠিও ছিল। কিন্তু উৎসাহী তথাকথিত রবীন্দ্রানুরাগী কী করলেন? শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠি-কয়টি বাদ দিয়ে দিলেন, সে সব চিঠি এখন থাকবে কোথায়? তাঁরা ছিন্নপত্র বাতিল করে আরও অজস্র চিঠি যুক্ত করে এক অভিনব কাণ্ড করলেন, তার নাম দিলেন—ছিন্নপত্রাবলী। এসব মতলব কার, কিসের জন্যে,—এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করা হোক, এদেশের জনসাধারণ এ দাবি অবশ্যই তুলতে পারেন।

কপালে রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত তিলক প'রে যাঁরা কিংবা যিনি এই ধরনের অনাচার করেন তাঁদের যথোপযুক্ত শাস্তি হোক—এই হচ্ছে আমাদের দাবি।

শিশিরকুমার দাশ এক মহাউপকার করলেন। তিনি নতুন করে এই বিষয়টি উত্থাপন করে দেশের লোকের মনোভাব জানালেন।

সুনীল রায় কিছুকাল আগে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় খুঁটিনাটি করে সব ব্যাপারটা তুলে ধরেছিলেন। আমরা তখন বালুরঘাট লাইব্রেরিতে বসে তাঁর 'স্বগত ভাষণ' নামক স্মৃতিকথা দল বেঁধে মনোযোগ দিয়ে পড়তাম। তিনি 'বিশ্বভারতী'তে দীর্ঘকাল ছিলেন। সাহিত্যে তাঁর দান যথেষ্ট। বিশ্বভারতী পত্রিকাও সম্পাদন করেছেন। সুতরাং তাঁর উক্তি ও যুক্তি আমরা মান্য করে নিতে বাধ্য।

শিশিরবাবুও কি অনুরূপ কটুকাটব্য শুনবেন? হায়, সত্যিই, কী বিচিত্র এই দেশ।

অধ্যাপক জ্যোৎস্নাকুমার সেন
রায়গঞ্জ পশ্চিম দিনাজপুর

সবিনয় নিবেদন,

বিভাব সত্যিই খুব উচ্চমানের কাগজ হচ্ছে। কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়ে যাবার পর এখন এর একটি স্পষ্ট আলাদা চরিত্র লক্ষণ বোঝা যায়। এমন সর্বাঙ্গ-শোভন কাগজ এত অল্প দামে কি করে আপনারা দেন? তা ছাড়া শুনলাম আপনারা প্রত্যেক লেখককে লেখার জন্য কিছু না কিছু পারিশ্রমিকও দেন। সত্যিই অবাক হবার মতো ঘটনা!

আমাদের কলেজে বিভাব প্রত্যেক সংখ্যা আসে। কলেজ লাইব্রেরীতে অনেকেই পড়েন, বা পড়তে চান। আমাকে আলাদা করে গ্রাহক করে নেবেন, টাকা পাঠালাম। ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করে রাখা উচিত। অনেক প্রবন্ধ পরে গবেষণার কাজে লাগতে পারে। রাধারমণ মিত্রর লেখার পরিশ্রম বিস্ময়কর!

আর আপনাদের ধন্যবাদ, আপনারা নিত্যপ্রিয় ঘোষের মতো একজন নতুন প্রবন্ধকারকে খুঁজে বে'র করেছেন। এমন মনস্ক ও পরিণত ভাষার প্রাবন্ধিক আজকাল চোখেই পড়ে না। অলোক রায়ও খুব ভাল, ভাল কবিতাগুচ্ছের অনেকের লেখাই। তবে সমালোচনা (না আলোচনা?) বিভাগটির বড় দৈন্যদশা। এ দিকটায় একটু নজর দেবেন। বিনীত—

অধ্যাপক তরুণকুমার গুপ্ত, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ

প্রিয় সম্পাদক,

'বিভাব' পত্রিকাটি শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ভাবনা বিষয়ক বোধি ও মননে-র উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

আমাদের 'বিভাব' এই শিক্ষাই দেয়—'There is first the literature of knowledge and secondly, the literature of Power'—সাহিত্যে ও শিল্পে এই 'পাওয়ার' ও 'নলেজ'র চিরায়ত সতীনের কলহ চলছে,—চলবে। তবুও 'বিভাব' পত্রিকাটি এখন অন্যান্য যে কোন পত্রিকার চেয়ে অভিজাত, সম্ভ্রান্ত। যে কোনো একজন চরিত্রবান পাঠক ও লেখকের অবশ্যপাঠ্য পত্রিকা। তবুও একটি মাত্র অভিযোগ যে, প্রতিষ্ঠিত নীরেন্দ্রনাথ, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি, অলোকরঞ্জন, সুনীল ব্যতীত অনেক কবিই—'বিভাব' এর পাতাগুলিকে যদি আলোকিত করে তবেই বিভাব পত্রিকাটির নামকরণের সার্থকতা বহন করবে। যেমন ৭০ দশকের কবির কবিতা—পার্থপ্রতিম, রণজিত দাশ, অমিতাভ গুপ্ত, বীতশোক

ভট্টাচার্য, কমল চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি দাশ, মুকুল দাশগুপ্ত, অনির্বাণ লাহিড়ি, জয় গোস্বামী, গৌতম চৌধুরী। ইতি—

সুনীল মিত্র, সম্পাদক 'বিভিন্ন কোরাস'

শোক-সংবাদ

পাতিরাম ঃ কলেজ স্ট্রীটের পাতিরাম বুকষ্টলের প্রতিষ্ঠাতা পাতিরাম পারিজা মারা গেছেন। এই পত্র-পত্রিকা পরিবেশক সংস্থা শুধুমাত্র দৈনিক সাপ্তাহিকগুলিই নয়, সমস্ত পত্র-পত্রিকার এমনকি সুদূর শহরতলির প্রান্ত থেকে যে সব দীনচেহারা অথচ ইস্পাত চরিত্র লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়, তাদেরও সুষ্ঠু প্রচারের ব্যবস্থা করে এসেছেন বহু বছর ধরে। পাতিরাম পারিজার মৃত্যুর পরেও আমরা আশা করবো তাঁর উত্তর সূরীরা পূর্বেকার মতো পত্রিকাগুলোর সুষ্ঠু প্রচারের ব্যবস্থা রাখবেন।

কপিল ঃ বিহারের কোন এক অখ্যাত গ্রাম থেকে এসেছিলো কপিল নামের এক সরল, নিষ্পাপ, নিরহঙ্কারী কিশোর। এই কপিলও ছিলো পাতিরামের বুকষ্টলের সদাব্যস্ত একজন কর্মী। লিটল ম্যাগাজিনের জন্য কপিলের বুকে বড় মায়া ছিলো। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-র কাছে একটা রঙিন জামা চেয়েছিলো সে। হায়, তা আর পরা হলো না, কপিল আমাদের ছেড়ে চলে গেলো।

—প্রদীপ দাশগুপ্ত

Let your savings grow through your deposits with our various attractive scheme.

1. Savings Bank Account. 2. Family Benefit Deposit Account. 3. Fixed deposit Account. 4. Recurring Deposit Account. 5. Monthly Income certificate. 6. Gratuity-Cum-Pension Scheme. 7. Gift-Cum-Cash certificate. 8. Cash Certificate. 9. Endowment Benefit Deposit. 10. Deposit link Janata Rersonal Accident certificate.

YEARLY INTEREST INCOME UPTO Rs. 3,000/- IN AGGREGATE FROM DEPOSIT INVESTMENT—FREE OF INCOME-TAX, NO DEDUCTION OF TAX AT SOURCE.

Contact :
United Industrial Bank Ltd. 7, Red Cross Place,
or Cal-1.
any of its Branches. Phone : 23-9784-86

Chairman : Sri J. N. Biswas.

With Best Compliments from

M/S MADHURI INDUSTRIES
1/1, Vansittart Row
Cal-700001.

BIVAV
Special Combined Number : October-December 1977
and January-March 1978
Price Rs. 3.00
Vol. 2 Number 2 and 3 RN 30017/76

For efficient and prompt lighterage services

Please Contact

PORT SHIPPING COMPANY LTD.
5, SYNAGOGUE STREET
CALCUTTA-700 001

Gram : CARGOHAND Phone : 22-8906-9